গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৮ মে, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

শেয়ার বাজারের রাজনীতি

লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরদিন (১৪ মে) থেকে শুরু করে ১৯ মে'র (বুধবার) মধ্যে ভারতবর্ষের শেয়ার বাজারে মারাত্মক ধস এবং নাটকীয় উত্থান পর পর ঘটে গিয়েছে। অন্ধ্রে চন্দ্রবাবু নাইডুর সরকারের পতনের পর থেকেই শেয়ার বাজার উল্লেখযোগ্যভাবে পড়তে শুরু করেছিল। সবচেয়ে বড় ধস নামে সোমবার, ১৭ মে। এই একদিনের মধ্যে সেনসেক্স (মুম্বই স্টক মার্কেটের ৩০টি শীর্ষস্থানীয় শেয়ারের দামকে ভিত্তি করে তৈরি সূচক) ৮৪৩ পয়েন্ট পড়ে যায়। ফলে, একদিনে বাজারে নথিভুক্ত সমস্ত শেয়ারের মোট দাম (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) ১,৩৩,৬০২ কোটি টাকা কমে যায়। ১৪ থেকে ১৭ মে'র মধ্যে শনি-রবি বাদে দু'দিনের কেনাবেচায় সূচক পড়ে যায় প্রায় ১০০০ পয়েন্ট। শেয়ারের মোট দাম থেকে ২ লক্ষ কোটি টাকা খোওয়া যায়। পরদিন, অর্থাৎ ১৮ মে থেকে আবার বাজার চড়তে শুরু করে এবং ওই দিনই সেনসেক্স ৩৭২ পয়েন্ট চড়ে যায়। বুধবার, ১৯ মে'র মধ্যে বাজারের ক্ষতি আধাআধি পূরণ হয়ে যায়। বৃহৎ শিল্পপতি মহল এবং শেয়ার দালালরা আশ্বস্ত হয়। কেউ কেউ বলতে শুরু করে — বাজার পড়ে, আবার আভ্যন্তরীণ শক্তির জোরে বাজার উঠে দাঁড়ায় — এটাই বাজারের নিয়ম, কাজেই গভীর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারতীয় শেয়ার বাজারের ১২৯ বছরের ইতিহাসে একদিনের সর্ববৃহৎ এই ধসের পিছনে কোন অর্থনৈতিক কারণ আছে কিনা, নাকি

ছয়ের পাতায় দেখুন

আম্বানি উবাচ

ওয়াশিংটনে ১৯ মে মার্কিন শিল্পপতিদের এক সম্মেলনে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি সিপিএম-সিপিআই সম্পর্কে বলেন, ''আন্তর্জাতিক লগ্নীকারী এবং বিশেষজ্ঞদের ভারতের কমিউনিস্টদের নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কী আছে? এর আগে চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে তো কাজ করেছেন। কোনও অসুবিধা হয়েছে? তা হলে ভারতীয় কমিউনিস্টদের ব্যাপারে অ্যালার্জি কীসের? আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, ভারতে কমিউনিস্টরা উল্টে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে সমালোচকদের লজ্জিত করবে।'' *(দি স্টেটস্‌ম্যান, প্রতিদিন ২২-৫-০৪)*

রাজ্যে সিপিএমের ঝড়, মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসী সাইক্লোন

মুর্শিদাবাদে রক্তক্ষয়ী নির্বাচন হয়ে গেল। চারজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত শতাধিক। জেলায় কংগ্রেসের 'সাইক্লোন' এবং রাজ্যে সিপিএম-ফ্রন্টের 'ঝড়' প্রকৃতপক্ষে একই ধরনের 'অবাধ' নির্বাচনের ফল।

মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের ডোমকল বিধানসভা ক্ষেত্রের ৭১, ১৬৮, ১২১, ১২২ নং বুথে, জলঙ্গীর ৫৪ ও ৫৬ নং বুথে পুনর্নির্বাচন এবং বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের বহরমপুর বিধানসভা ক্ষেত্রে ১১৯, ১৩৪ নং বুথে যে পুনর্নির্বাচন হয়ে গেল তা বোমা ও বন্দুকবাজি করে বুথ দখলের পরিণতি ও প্রমাণ। ডোমকল সারাংপুর অঞ্চলের বেনেখালির ৬৯নং বুথ যে দখল হল ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে তার কৃতিত্ব সিপিএমের। আবার ঐ অঞ্চলের সাহাবাজপুর এলাকায় ৭১নং ও ৭২নং বুথ দখলের বাহিনী হল কংগ্রেস। পরে ৭১নং-এ পুনর্নির্বাচন হল। দৌলতাবাদ থানার ওসি'র পরিচালনায় প্রাক্তন কংগ্রেসী দুষ্কৃতীরা অধুনা সিপিএমের আশ্রয়ে এসে প্রকাশ্যে বুথ দখল করেছে। ১৩৩নং বুথের প্রিসাইডিং অফিসার বললেন, বুথে কোন গণ্ডগোল নেই। এগারোটার মধ্যে ৯৯৮ জনের মধ্যে ৩১২টা ভোট পড়েছে। এস ইউ সি আই প্রার্থীর এজেন্ট ছিলেন সাইফুল ইসলাম। বর্তমান-এর সাংবাদিকের কাছে বললেন ঃ বড় দেরি করে এলেন দাদা। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ কংগ্রেসের এজেন্ট চাঁদ মহম্মদ সহ আমাদেরকে সিপিএমের লোকজন টেনে বের করে দিল। প্রিসাইডিং অফিসার বাধা দেওয়ায় তাঁর টুঁটি চেপে ধরেছিল ওরা। আর ১৩৪নং বুথের চিত্রটা কী? ভেতরে নির্বাচনী এজেন্ট বলতে সিপিএমেরই দু'জন। প্রিসাইডিং অফিসার রেজাউল করিম অসুস্থ। তিনি শুয়ে আছেন। তাঁকে একজন সিপিএম সমর্থক পাখার হাওয়া দিচ্ছেন। ইলেকট্রনিক ভোট মেসিন চালাচ্ছেন কনস্টেবল। তৃতীয় পোলিং অফিসার আবদুল্লা সেখ জিজ্ঞাসা করলেন, দাদা, আপনাদের কাছে পেন কিলার আছে ? (বর্তমান, ১১-৫-০৪) অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের যন্ত্রণায় তিনি তখনও

দুয়ের পাতায় দেখুন

আপনাদের পদ্ধতি কোথায় আলাদা, মুখ্যমন্ত্রী?

দিল্লিতে নতুন সরকার গঠনপর্বের শুরুতে সিপিআই-সিপিএম নেতৃবৃন্দ যখন পূর্বতন এন ডি এ সরকারের বিলগ্নীকরণ-বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রবল হুঙ্কার ছাড়ছেন সেই সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুকে একদল সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন — দেশে সংস্কার পদ্ধতি ব্যাহত হবে বলে শিল্পপতিরা কি খুব চিন্তিত? উত্তরে বুদ্ধদেববাবু বলেন, ''তা কেন? বামফ্রন্ট সরকার সংস্কার চায় না, এমন তো নয়? আমরাও সংস্কার চাই। কিন্তু তা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে।'' কী সেই 'নিজস্ব পদ্ধতি'? রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলোকে বিলগ্নীকরণের প্রশ্নে বুদ্ধদেববাবুর জবাব ''আমাদের ব্যাপারটা আলাদা। এ রাজ্যের যে ৫৬টি কারখানা অধিগৃহীত হয়েছে, সেগুলি আদতে বেসরকারি সংস্থা। আর বিদায়ী সরকার জনগণের টাকায় তৈরি শিল্পের বিলগ্নীকরণের চেষ্টা করছে।''

যে পার্থক্য নেই, তাকেই দেখাবার তাড়াহুড়োয় মুখ্যমন্ত্রী খেয়াল করেননি, তিনি একটি হাস্যকর যুক্তি করেছেন। কারণ, তাঁর যুক্তিধারা মেনে নিলে, কয়লা-বীমা-ব্যাঙ্ক শিল্পে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধতাই করা যায় না। কারণ, এইসব শিল্প এদেশে সূচনায় বেসরকারি মালিকানাতেই গড়ে উঠেছিল। পরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয়করণের মাধ্যমে এগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পরিণত হয়। দিল্লিতে বুদ্ধদেববাবুর দল কিন্তু এগুলি বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধতা করছে! তাহলে বুদ্ধদেববাবুর সেই বিরোধিতা কি অন্তঃসারশূন্য নয়?

এখানেই শেষ নয়, বিজেপি বা কংগ্রেসের মতো বুর্জোয়া দলগুলির শিল্পনীতির সঙ্গে তাঁদের বিস্তর পার্থক্য দেখাতে সিপিআই-সিপিএমের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব দিল্লিতে যখন 'সরকারি সংস্থা বন্ধ করা চলবে না' বলছেন, ঠিক তখনই খোদ পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার, সরকারি সংস্থা 'ওয়েবেল'-এর ৫টি ইউনিট বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রুগ্নতার অজুহাতে এই সংস্থাকে ছেঁটে ছোট করে ফেলার রাস্তা ধরেছেন তাঁরা, সুতোর আগায় ঝুলছে ওখানকার ৭০০

আটের পাতায় দেখুন

'যুদ্ধ নয়, শিক্ষার জন্য টাকা দাও' স্লোগান মার্কিন দুনিয়ায়

শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ কমানোর সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানডিয়েগোর ৮টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গত ২৬ এপ্রিল ক্লাস বয়কট করে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। ঐদিন প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী মিছিল করে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর আর্নল্ড স্কোয়ারজেনেগারের দপ্তরের দিকে এগিয়ে যায়, মুখে তাদের স্লোগান — 'ছাত্রছাত্রীদের ওপরে নয়, ধনীদের ওপরে কর চাপাও', 'শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমানো চলবে না' ইত্যাদি। 'ANSWER' সংগঠনের সদস্য পিট রেইলি জড়ো হওয়া মানুষদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, 'একটা বেআইনি, সাম্রাজ্যবাদী জঘন্য যুদ্ধের প্রয়োজনে মার্কিন সরকার যখন ১৬০ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তখন শিক্ষার মতো সাধারণ মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় খাতে অর্থব্যয় করতে হলে তারা অভাবের অজুহাত দেয় কোন্ আইনে?' চারিদিকে তখন ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে দাবি তুলেছে — 'যুদ্ধের জন্য নয়, শিক্ষাখাতে টাকা খরচ করতে হবে।' (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ৮-৫-০৪)

নির্বাচন অবাধ, কিছুতেই বাধা নেই

একের পাতার পর

কাতর! বহরমপুর লোকসভার বহরমপুর বিধানসভা ক্ষেত্রে ঘাসিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩৩ ও ১৩৪নং বুথে এই হল সকালের ছবি।

বেউচিতলার ১২২, ১২৩, ১২৪ নং বুথ হয়ে উঠেছিল রণক্ষেত্র। প্রিসাইডিং অফিসার সুশীল কুমার ঘোষ বললেনঃ আপনারা যা করতে চান করুন। খাতায় কলমে ৪১৯টা ভোট হলেও মেশিনের হিসাবে তখন ৫১৭টা ভোট পড়ে গিয়েছে। আর ১২৩নং বুথে বেলা দুটোয় ৭৪৩টা ভোটের মধ্যে ৬৫৫টা ভোট পড়ে গেল। (সূত্র ঐ)

বহরমপুর ক্ষেত্রের হরিদাসমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫নং রঘুনাথতলা আই সি ডি এস সেন্টার বুথ। পরিচয়পত্রওয়ালা ভোটাররা পরিচয়পত্র নিয়ে ফিরে যাচ্ছে বাড়ি। তাদের ভোট নাকি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এস ইউ সি আই কর্মী কুমার হাজরা ও তাঁর ছেলে মনোজিৎ পরিচয়পত্র নিয়ে হাজির। যথারীতি ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। শেষে অবজার্ভারের গাড়ি ধরে রিপোর্ট করলে অফিসার ঐ বুথে গিয়ে সকলের চাকরি খাওয়ার হুমকি দিলে কংগ্রেসের এজেন্ট পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ মণ্ডল সকলের সামনে হাত ধরে কুমার হাজরার কাছে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু ভোট ? সে তার আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। বহরমপুর লোকসভার কান্দী বিধানসভা ক্ষেত্রে ভোটকাণ্ডের প্রমাণ হিসাবে ৬৯নং বুথ, ঘনশ্যামপুরে ভোট পেল কংগ্রেস ৫০৪, আর এস পি প্রার্থী ৬৯। এখানে মোট ভোট পড়েছে ৬১৪। আর ৭০নং বুথে কংগ্রেস ৪৭৩, আর এস পি ৮৭। মোট ভোট পড়েছে ৬০৫। সিপিএম ও কংগ্রেস গুরুত্ব দিয়ে কেউ কারুর বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এ জেলায় তোলেনি। সংঘর্ষ-বোমাবাজি-প্রশাসনিক সহায়তায় যেমন সিপিএম বুথ দখল করেছে, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপমুক্ত অবস্থায় বোমাবাজি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কংগ্রেসও বুথ দখল করেছে। দুইপক্ষই কিন্তু নিঃশব্দে বুথ দখল করেছে সারা জেলায় বিস্তর সংখ্যক। বিপক্ষের এজেন্ট ভাগিয়ে দিয়ে ভোট করা, পরিচয়পত্র ছাড়া জাল ভোট করা, প্রিসাইডিং অফিসারদের সপরিবারে বেঁচে থাকার সুযোগে'র গ্যারান্টির বিনিময়ে নিঃশব্দে ভোট যন্ত্র দখল করা বেশ নাটকীয় পর্যায়ে উঠেছিল। ভোটের অঙ্কেই তার প্রমাণ মিলছে।

মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের মুর্শিদাবাদ বিধানসভা ক্ষেত্র লোচনপুর এলাকায় ১১২নং বুথ —নওদাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৬১ ভোট পেল কংগ্রেস, সিপিএম ৮৬৯ ভোট। মোট ভোট পড়েছে ৯৪১টি। এখানে গোপীনাথপুর ১১৫নং বুথে ১০৯টি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস, ৮০৫টি সিপিএম। ভোট পড়েছে ৯৬৯। বুথ কব্জা করেছে সিপিএম। আবার প্রসাদপুর অঞ্চলের ৪৩নং বুথ চুনাখালি এস কে ইউ এস (রুম নং ২) — এখানে ৩৩৫টি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস, ৯৩টি পেয়েছে সিপিএম। ভোট পড়েছে ৫১৩টি। বুথ ছিল কংগ্রেসের কব্জায়। আবার জলঙ্গী বিধানসভা ক্ষেত্রে কাতলামারী অঞ্চলে ১৭৩নং বুথ — মুন্সীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে কংগ্রেস ভোট পেল ৩০১ আর সিপিএম ৬টা। মোট ভোট পড়েছে ৩৯০। সাদিখাঁরদিয়াড় অঞ্চল প্রসন্ননগর প্রাথমিক বিদ্যালয় বুথ নং ৭৪ — এখানে কংগ্রেস পেয়েছে ৪১৪টা ভোট, সিপিএম ৭টি। মোট ভোট পড়েছে ৪৮৯টা। বুথ দখলে কংগ্রেস এগুলিতে চ্যাম্পিয়ন। জলঙ্গীতে কংগ্রেসের চোরাস্রোত।

আবার ডোমকল বিধানসভা ক্ষেত্রে যুগিন্দা অঞ্চল — শেখালিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। বুথ নং ১০০। ৫৯টি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস, ৯৭০টি সিপিএম। মোট ভোট পড়েছে ১০৪০ ! জবাব দিয়েছে কংগ্রেস ১১৬নং ও ১১৭নং বুথে। চাঁদেরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় বুথে কংগ্রেস পেয়েছে ৫১২, সিপিএম ৫২ ভোট। মোট ভোট পড়েছে ৫৭৬। ১১৭নং কুপিলা মাদ্রাসা (পশ্চিম) বুথে কংগ্রেস ৬৩৬ ভোট পেয়েছে, সিপিএম ৮৯ ভোট। এখানে মোট ভোট পড়েছে ৭৩৩। ডোমকল বিধানসভা ক্ষেত্রের আরও কয়েকটা বুথের ছবি দেখা যাক। ১১৮নং বুথে ৫০২টা ভোট পড়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ৪০৭, সিপিএম ৮৯। ১১১নং বুথে কংগ্রেস পেয়েছে ১০০০ আর সিপিএম ৭১। মোট ভোট পড়েছে ১০৮৫। আর ১১৫নং বুথে কংগ্রেস ৫টি, সিপিএম ৫১১টি। মোট ভোট পড়েছে ৫২৪ ! এরই নাম হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ! জনতার রায় !

জঙ্গীপুর লোকসভার নবগ্রাম বিধানসভার দু-একটি নজিরই যথেষ্ট হবে। ১৫১নং বুথ। ৮২টি সিপিএম, ৪৪১টি কংগ্রেস, অন্যান্য ৪২। ভোট পড়েছে ৫৬৫টা। ১২৮নং বুথে সিপিএম ৭৩, কংগ্রেস ৩১৮, অন্যান্য ৩২টা। মোট ৪২৩। এইভাবেই জঙ্গীপুরে সিপিএম বিরোধী হাওয়ার সাথে বুথ দখল আর বিজেপির ভোট যুক্ত হয়ে প্রণববাবুর সপক্ষে 'ঝড়' উঠেছে। জঙ্গীপুর ১৪নং বুথে পুনর্নির্বাচন হয়েছে। তেমনই বহরমপুরের সাংসদের সপক্ষে এমনতরো ভোটের হাওয়া কাজ করে ঝড় তুলেছে। মার্জিন বাড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, তৃণমূল-বিজেপির ভোট কংগ্রেস সাংসদের বাক্সেই ঢুকেছে। আর মুর্শিদাবাদ লোকসভায় যার জয়ের কথা অনেকেই ভাবেননি — তার সপক্ষে সাইক্লোন আর চোরাস্রোতের পিছনে বুথ দখলের হিম্মত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। সঙ্গে তৃণমূল-বিজেপি'র ভোটটা উপরি পাওনা।

কংগ্রেস-বিজেপি'র এক ধরনের গোপন বোঝাপড়া, গোপন সন্ত্রাস, বুথ দখলের রকমারি বৈচিত্র্যের সঙ্গে সিপিএমের বুথ দখল ও সন্ত্রাসে অবাধ নির্বাচন অবাধ কারচুপির ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। যে অস্ত্রে সিপিএম জেতে, সেই অস্ত্রই কংগ্রেসের আজ শক্তিশালী হাতিয়ার।

কৃষক নেতা

কমরেড নরেশ নস্করের জীবনাবসান

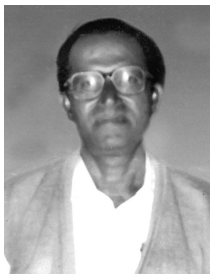

জয়নগর থানার ধোষা চন্দনেশ্বর অঞ্চলের বিশিষ্ট কৃষক নেতা ও এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নরেশ নস্কর গত ১১ মে মঙ্গলবার দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে সল্টলেকের হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কংগ্রেস সমর্থক বাড়ির সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৩-৬৪ সালে স্থানীয় জোতদারদের বিরুদ্ধে বেনাম ও খাসজমি উদ্ধারের আন্দোলনে তিনি অংশ নেন এবং তৎকালীন স্থানীয় এস ইউ সি আই নেতা কমরেড বসির সেখ, কমরেড পাঁচু নস্করের হাত ধরে কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সংস্পর্শে আসেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এস ইউ সি আই-এর সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। ছাত্র জীবনে ছাত্র সংগঠন করেন। বেনাম জমি উদ্ধারের আন্দোলনে জড়িত থাকায় তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। তিনি দলের সাংগঠনিক কাজে নিয়ত জড়িত থাকতেন এবং ঐ বিস্তীর্ণ এলাকায় দলের কর্মসূচি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সাধারণ মানুষের আপদে বিপদে তিনি সর্বদাই তাদের পাশে দাঁড়াতেন। একটানা ১০ বছর জেলা পরিষদের সদস্য হিসাবে এলাকার উন্নয়নের জন্য তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় স্কুল কমিটি, বাস ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, অটোরিক্সা ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে স্থানীয় মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মরদেহ জয়নগরে নিয়ে আসার পথে নেউতলা, শান্তিপুর, গোহালবেড়িয়া মোড়ে শত শত কর্মী-সমর্থক তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। ধোষাহাটের এস ইউ সি আই অফিসে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করেন রাজ্য কমিটির সদস্য বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড দীপঙ্কর রায়, কমরেড তপন রায়চৌধুরী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পাঁচু নস্কর, এম এস এস-এর পক্ষে কমরেড সফি পৈলান, ধোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, ধোষাহাটের হাটবাবুসহ স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। অগণিত নরনারী চোখের জলে তাঁকে শেষ বিদায় জানান।

কমরেড নরেশ নস্কর লাল সেলাম

উত্তর দিনাজপুরে ছাত্রভর্তির দাবিতে আন্দোলন সফল

উত্তর দিনাজপুর জেলার কমলবাড়ি-১ ও বরুয়া ২নং অঞ্চলের চতুর্থ শ্রেণী-উত্তীর্ণ বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর ভর্তি হতে না পেরে প্রবল সঙ্কটে পড়ছে। অভিভাবকরা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রবল দুশ্চিন্তায় পড়ছেন। এবছর ছত্রপুর, কাশিবাটী, রায়পুর, সোনাডাঙ্গা, রাঙ্গাপুকুর, কানাইপুরের প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক হন্যে হয়ে স্কুলে স্কুলে ঘুরছিলেন। এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট সংগঠক, শিক্ষক কমরেড অমূল্য চন্দ্র বর্মণের নেতৃত্বে এই অভিভাবকরা গ্রামে গ্রামে সংগঠিত হয়ে তৈরি করেন আন্দোলনের মঞ্চ অভিভাবক ফোরাম। ফোরামের পক্ষ থেকে কাশিবাটী বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে বারবার ছাত্রভর্তির দাবি জানালেও নানা অজুহাতে কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের ফিরিয়ে দেন। ২১ মে গণডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। আশপাশের সমস্ত গ্রাম থেকে অভিভাবকরা এই ডেপুটেশনে সামিল হন। ডেপুটেশনে কমরেড অমূল্যচন্দ্র বর্মণ ছাড়াও নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড সুরেশ বিশ্বাস, তরুণ বর্মণ এবং এ আই ডি এস ও'র জেলা সভানেত্রী মাধবীলতা পাল, জেলা কমিটির সদস্য মারফত আলি, ললিত ওরাওঁ, সাগরিকা বর্মন।

দাম্ভিক প্রধান শিক্ষক দাবি নিয়ে আলোচনায় কোনরকম আগ্রহ না দেখালে এবং নানাভাবে টালবাহানা করতে থাকলে ক্ষিপ্ত অভিভাবক, বিশেষত মহিলারা প্রধান শিক্ষকের ঘরের দরজার সামনে ধর্ণায় বসে যান, শুরু হয় ঘেরাও। খবর পেয়ে বহু ছাত্র-যুবক-সাধারণ মানুষ ঘেরাও-এ যোগ দেন। স্কুল পরিচালন কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের ওপর জমে থাকা ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। রাত সাড়ে সাতটায় স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রধান শিক্ষক সমস্ত ছাত্রকে ভর্তি নেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও তোলা হয়। এরপর অভিভাবকরা মিছিল করে আন্দোলনের জয়ে মুখরিত হয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসেন। এ আই ডি এস ও'র জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আন্দোলনে সামিল হওয়া অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে শিক্ষার অন্যান্য দাবিতেও স্কুলে স্কুলে এভাবেই আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পাহাড়ে কর্মীসভা

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই এবারই প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এই জেলার তিন পাহাড়ী বিধানসভা ক্ষেত্র দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং-এর দুর্গম অঞ্চলেও এস ইউ সি আই-এর নির্বাচনী বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পানীয় জলের সমস্যা। রয়েছে পরিবহন সমস্যাও। বিদ্যুতের মূল্য এখানে সমতলের তুলনায় অনেক বেশি। পাহাড়ে কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে দলের আন্দোলনও শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ আন্দোলনের ইউনিটগুলোও গড়ে উঠেছে। পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এই অঞ্চলের পশ্চাদ্‌পদতা দূর করতে কিছুই করেনি। করেনি ২৭ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্ট সরকারও। দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদও সমস্যার সমাধান করেনি। এই অবস্থায় এস ইউ সি আইয়ের আন্দোলনের আহ্বান সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করছে।

নির্বাচনের পর গত ১৯ মে দার্জিলিং-এর জি ডি এন এস হলে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল, বিপ্লবীরা নির্বাচনে লড়ে কেন প্রভৃতি দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন মল্লিক এবং চা-শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক।

স্ট্যালিনের রাশিয়ায় গণতন্ত্র কেমন ছিল

[পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ব্যাপক রিগিং, অবাধ বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোটের প্রশ্ন উঠলেই সংবাদপত্রের একাংশ, পুরোপুরি বিকৃতভাবে 'কমিউনিস্ট-শাসিত' 'একদলীয় শাসনে'র প্রসঙ্গ টেনে আনে। সিপিএমের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক অমার্কসবাদী নির্লজ্জ কার্যকলাপকে দেখিয়ে উদ্দেশ্য-মূলকভাবে প্রচার করা হয়, 'কমিউনিস্টরা সর্বত্রই এমন', 'স্ট্যালিনের রাশিয়াও এমনই ছিল', 'সিপিএম স্ট্যালিনবাদী'। এর দ্বারা বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতীক স্বরূপ স্ট্যালিনের মহান নেতৃত্বকে এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত এবং জনচক্ষে হেয় করার চেষ্টা করে, যাতে সিপিএমের অপশাসনের প্রতি বিরোধিতা থেকে মানুষ মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতি বিরূপ হয়ে যায়।

এবারের লোকসভা নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের রিগিংকে দেখিয়ে একটি সংবাদপত্র লিখেছে — ''এরকম 'অবাধ' ভোট কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিতে কিংবা একনায়কতন্ত্রের দেশেই দেখা যায়।'' (বর্তমান, সম্পাদকীয়, ১৬ মে, ২০০৪)। বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির মিথ্যা প্রচারের সুরে সুর মিলিয়ে এরা দেখাতে চায় কমিউনিস্ট শাসন ও একনায়কতন্ত্র একই জিনিস এবং এখানে কোন গণতন্ত্র নেই।

কিন্তু ইতিহাস বলে ঠিক উল্টো কথা। গত শতকের ত্রিশের দশকে প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়া ঘুরে এসে বহু মানবতাবাদী গণতন্ত্রী মানুষ, কমিউনিস্ট না হয়েও, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ব্যাপকতা ও গভীরতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ১৯৩১ থেকে '৩৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়াতে থেকে পেশায় শিক্ষক বৃটিশ মানবতাবাদী প্যাট স্লোন ১৯৩৮ সালে 'রাশিয়া উইদাউট ইলিউশন' বইতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। ১৯৪৫ সালে এটির বাংলা অনুবাদ 'বিপ্লবোত্তর রাশিয়া' নামে প্রকাশিত হয়।

এই ব্যাপক গণতন্ত্রের আস্বাদ পেয়েছিল যে রুশ জনগণ, আজও তার স্মৃতি জনমন থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি। তাই অতি সম্প্রতি রাশিয়ায় এক সমীক্ষা চালিয়ে প্রবল কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হার্ভার্ডের ঐতিহাসিক, রিচার্ড পাইপস বলেছেন, মার্কিন সরকার রাশিয়ায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রসারের জন্য প্রতি বছর ৮ কোটি ডলার খরচ করা সত্ত্বেও ''ব্যাপক রুশ জনগণ গণতন্ত্রকে এখন প্রতারণা বলেই মনে করেন।'' তাঁরা মনে করেন — এ ধরনের গণতন্ত্রে আসল ক্ষমতাটা থাকে মুষ্টিমেয় কিছু গোষ্ঠীর হাতে। তাঁদের মতে — বহুদলীয় নির্বাচন ভালোর চেয়ে খারাপ করে বেশি। (সূত্র ঃ স্টেটসম্যান ২০-৫-০৪)।

কেমন ছিল সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, একদলীয় শাসনের আওতায় জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটত কী করে, রাজনীতিবিদ না হয়েও প্যাট স্লোন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে যে বিবরণ দিয়েছেন, বর্তমানে তা জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এই অভিজ্ঞতা দেখায় পুঁজিবাদী গণতন্ত্র নয়, একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে জনগণকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে।]

১৯৪৬ সালে এক নির্বাচনী সভায় বলছেন কমরেড স্ট্যালিন

একদলীয় গণতন্ত্র

প্যাট স্লোন লিখছেন — ''সোভিয়েট রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল। রাশিয়ায় যাবার আগেও আমি তা জানতাম। একদলীয় একনায়কত্ব কী করে গণতান্ত্রিক হতে পারে এটা জানবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক ছিলাম। সোভিয়েটে থাকা কালে প্রথম বছরে অন্যান্য যে কোনো বিষয়ের চেয়ে একদলীয় পদ্ধতি সম্বন্ধেই আমি বেশি আলোচনা করেছি। ''একটি মাত্র রাজনৈতিক দল নিয়ে কী করে আপনারা গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারেন?'' আমি প্রশ্ন করতাম। ''আমাদের একটা দলের চেয়ে বেশি দলের দরকার কী? আমাদের দল হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর দল, আর আমাদের রাষ্ট্রও হচ্ছে শ্রমিক রাষ্ট্র। আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করার জন্য আমরা বহু পুঁজিবাদী দলের অস্তিত্ব কামনা করি না'', উত্তর পেতাম। বেশ, মেনে নিলাম। ''কিন্তু কর্মীদের মধ্যে মতানৈক্য হলে কী করেন? বিভিন্ন শ্রমিকগোষ্ঠীর বিভিন্ন মত থাকতে পারে এবং সে সব মত প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন।'' ''আমাদের দলের ভেতরেই এসব অনৈক্যের মীমাংসা সম্ভব। ঐ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে কোনো ভিন্ন রাজনৈতিক দল সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।'' খুশি হলাম না। আমি স্থির বিশ্বাস করতাম যে একদিন একটি রাজনৈতিক দলের শাসন ভেঙে গিয়ে কোনো না কোনো ভিন্ন মতাবলম্বী দল গড়ে উঠবেই। সোভিয়েটে বাস ও কাজের ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর এবং ইংল্যান্ডে ফিরে এসে এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর আমার এই ধারণা মন থেকে একেবারেই মুছে গেছে।

সোভিয়েটে একদলীয় শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে এই যে একটা বিরাট গোলমেলে ধারণা, এটা হচ্ছে অনেকটা সেই দল সম্বন্ধে ভুল বোধের ফল। এটি আদৌ একটি পার্লামেন্টারি পার্টি নয়। আমি নিজেও আস্তে আস্তে দলের কার্যাবলী ও সাধারণের এর প্রতি আচরণ দেখে এটা বুঝতে পারি। ১৯৩৩ সালের হেমন্তকালে দল থেকে অবাঞ্ছিতদের সরিয়ে দেওয়ার সময়ে এর ভালো অভিব্যক্তি হয়েছে। আমি তখন ওখানে ছিলাম। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি হল ''শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ অগ্রবাহিনী'' মানে সমগ্র শ্রমিকগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ যারা সামাজিক উন্নতির সাধারণ কর্মপন্থা পরিকল্পনার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব নেওয়ার যোগ্য তাদেরই মিলিত সংঘ। কোনো প্রতিষ্ঠানই এই দাবি সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না, যদি না কাজের ভেতর দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ থাকে এবং তাদের কর্মীরা জনসাধারণের মতের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়। এই পদ্ধতির ফলে প্রত্যেক বছর দলের সকল সভ্য যে এলাকায় তারা কাজ করে সেই এলাকার জনসাধারণের কাছে তাদের কাজের হিসাব নিকাশ দেয় — দেয় তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান কাজের খতিয়ান। সবশেষে তাকে প্রমাণ করতে হয় শ্রমিকশ্রেণীর ''সংঘবদ্ধ অগ্রবাহিনীর'' সভ্য হবার জন্য তার দাবির যৌক্তিকতা।

এ ধরনের সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে। যে কেউ ইচ্ছা করলে সম্ভাবিত দলচ্যুত সভ্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে নানারকম প্রশ্ন ও আলোচনাও করতে পারে। এরূপে কোনো কমিউনিস্ট কর্মী তার যোগ্যতা প্রমাণ করলেও আলোচনা এবং প্রশ্নের ভেতর দিয়ে তার দাবির অযৌক্তিকতা প্রমাণ হয়ে যাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। প্রমাণ হতে পারে, সে যেমন বলছে তেমন করেনি। মানে তার কাজের ভেতর এমন গলদ আছে যেটা দলের সুনামের পক্ষে হানিকর বা পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনে তার আচরণ এত আপত্তিকর যে সে জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জনে অক্ষম। এ ধরনের অভিযোগ খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তির অভাব হলে, সমালোচনা সত্য প্রমাণিত হলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার।

এ ধরনের একটি সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে একজন দলচ্যুত পার্টি সভ্যের বিরুদ্ধে দর্শকদের সামনে লাল ফৌজের একজন সৈনিক কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করল। এই কমিউনিস্ট কর্মী বলেছিল সে ১৯১৭ সাল থেকে দলের সভ্য। কিন্তু যে সময়ে সে বলশেভিক ছিল বলে বলছিল সেই সময়েই লাল ফৌজের এই সৈনিকটি তাকে শ্বেত রাশিয়ানদের পক্ষে লড়বার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। এই সৈনিকটি এ ব্যাপারের জন্যই বিশেষ করে তৈরি হয়ে এসেছিল। স্পষ্টতই এই ধরনের প্রশ্ন সেখানে সমাধান হওয়ার নয়। তাই অভিযোগকারীকে সমস্ত তথ্য লিখিতভাবে ''নির্দিষ্ট কমিশনের'' কাছে পাঠাবার জন্য বলা হয়। একটা বিশেষ তদন্তের জন্য এটা স্থগিত রাখা হয়। অন্যান্য ব্যাপারে নারী-পুরুষ যেই হোক না কেন, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করলে, তার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের অবতারণা করা হয়ে থাকে। অন্য দেশের মতো সোভিয়েটে জনমতের এ ব্যাপারে মাপকাঠি রয়েছে এবং সেখানে জনমত কমিউনিস্টদের কাছে আদর্শ জীবনযাপনের দাবি রাখে। পরিশেষে কর্মস্থলে তার আচরণ, দায়িত্বহীনতা, অধীনস্থদের প্রতি কর্তৃত্বের ভাব, অলসতা, এ ধরনের সমস্ত প্রশ্নই সেখানে আলোচিত হয়।

১৯৩৩ সালে রাজনৈতিক কার্যাবলীতে কপটাচরণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দল থেকে অবাঞ্ছিতদের সরিয়ে দেবার সময়ে যে সব কমিউনিস্ট তার পূর্বতন কার্যাবলী অকপটে ব্যক্ত করেছে, এমনকী বিপ্লবের সময়ে তার বিরুদ্ধ মনোভাবেরও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি, তাদের বিরুদ্ধে আমি কোনো সমালোচনা শুনিনি। যতক্ষণ সে একটানা অকৃত্রিমভাবে তার পূর্বাপর ইতিহাস বলে গেছে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে একটিও প্রশ্ন ওঠেনি। যখনি কেউ গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করেছে বা কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছে, তখনি দর্শকবৃন্দ ও উক্ত কমিশন তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে। সোভিয়েটে রাজনৈতিক কপটতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর দুর্নাম। কারো পূর্বতন কার্যাবলী সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দেওয়া মানে এদেশের চাকরি প্রার্থীর জন্য মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়ার মতই নিন্দার্হ। দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের বহু কপট রাজনীতিবিদের সোভিয়েটের এই জনপ্রিয় যাচাইব্যবস্থার মতো ব্যবস্থার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হবার সম্ভাবনাই নেই।....

১৯২১ সালের গোড়ার দিকে লেনিন 'দল বিশুদ্ধকরণ' নীতির প্রবর্তন করেন যাতে করে যে দল সারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব করার দাবি রাখে, সেখানে কোনমতেই দলের কোনো লোক শ্রমিকশ্রেণীর শ্রদ্ধা বা সমর্থন না পেয়ে নেতার আসনে উপবিষ্ট না হতে পারে। দলের সুষ্ঠু নেতৃত্ব এবং 'দল বিশুদ্ধকরণ নীতির' ফলে দলের ভেতরে কারা থাকবে, জনসাধারণ তার বিচারক হওয়ায় সোভিয়েটের নাগরিকরা দলকেও রাষ্ট্রের মত 'আমাদের' বলে ভাবতে শুরু করেছে। ফলে তারা তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার সংঘ হিসাবে দলকে পুষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে ত্রুটি করে না।

আজকে বৃটেনে যদি আমাদের এরূপ একটি শ্রমিকশ্রেণীর দল থাকত এবং জনসাধারণ ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপর তার সভ্য থাকার যোগ্যতা নির্ভর করত, তাহলে বর্তমান সভ্য সংখ্যা কমে দশ ভাগের এক ভাগে পৌঁছাত এবং সভ্যদের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে লোকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত। কোনো জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচন ব্যাপারে এ সব সভ্য যোগ্য শ্রমিক নেতা হিসাবে সংবর্ধনা পেত। দুর্ভাগ্যবশত কী মন্ত্রণাসভার

চারের পাতায় দেখুন

স্ট্যালিনের রাশিয়ায় গণতন্ত্র কেমন ছিল

তিনের পাতার পর

ব্যাপারে কী স্থানীয় নির্বাচনপ্রার্থীর ব্যাপারে আমাদের এরূপ কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

সোভিয়েট নাগরিকদের শুধু আমি উৎসাহভরে ''আমাদের দল'' ও ''আমাদের সরকার'' বলতে শুনিনি, অত্যন্ত গর্ব এবং আনন্দের সঙ্গে বারবার ''আমাদের স্ট্যালিন'' বলতেও শুনেছি। পাশ্চাত্য নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধারায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে এ সব স্থূল বলে মনে হবে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে এর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে আমার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। ১৯৩৬ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে আমি সোভিয়েট জীবনের এই বিশেষ দিকের মূল ছবি স্পষ্ট দেখতে পাই।

লিঁও ফুচেট ওয়ানগার অন্যান্য বিষয়ের মত স্ট্যালিনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ''এভাবে প্রশংসায় ভূষিত হওয়া স্ট্যালিন অত্যন্ত অপছন্দ করেন, মাঝে মাঝে এ নিয়ে হাসি তামাসাও করেন।'' স্ট্যালিনের একটি বক্তৃতা আমার মনে আছে যাতে যারা কাজ করার বদলে নেতাদের কাছে এরূপ অভিনন্দনপত্র দেওয়া ও আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ব্যগ্র, তিনি তাদের দস্তুরমতো কশাঘাত করেন।

১৯৩৬ সালে সোভিয়েট থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্ট্যালিনের প্রশংসা প্রসঙ্গে এ হচ্ছে আমার কৈফিয়ৎ। এ দেশে অন্যান্য ব্যাপার দেখার পর, আমার মনে হয় ভাষাগত কৈফিয়তে বেশি জোর দিতে গিয়ে কতক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ গেছে। নেতৃত্বের জনপ্রিয় ধারণা সম্বন্ধে আজকে বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে এটা হচ্ছে মূলগত পার্থক্য। আজকে বৃটেনে, সারা দেশব্যাপী বেশি সংখ্যক জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে এরূপ কোনো রাজনৈতিক বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নেই। কাজেই কোনো নেতাকে শ্রদ্ধা না করে তাকে সমালোচনা করতে হবে, তার নীতি অনুসরণ না করে করতে হবে বাধা সৃষ্টি, এ হচ্ছে এখনকার সাধারণ মনোভাব। এ অবস্থার সঙ্গে আমরা এতখানি অভ্যস্ত হয়েছি যে এটাকেই আমরা গণতান্ত্রিক ভাব বলে অভিহিত করি। আসলে এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের অসুস্থ মনোভাবের লক্ষণ। যে গণতন্ত্রে সাধারণ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ বর্তমান, সেখানে গণতন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদই হয়ে থাকে।.....

আজকে এই সংকটপূর্ণ অবস্থায় নেতাদের বেশি জনপ্রিয় হতে হলে জনসাধারণকেও প্রাপ্য সম্মান তাঁদের দিতে হবে। যদি স্যার ওয়ালটার সিট্রাইন ও নেভিল চেম্বারলেন বলেন, ''নেতা আসে, নেতা যায় কিন্তু জনসাধারণ শাশ্বত'' তবে অবশ্যই তাঁরা শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক বলে পরিচিত হবেন। জনসাধারণ তাঁদের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শ্রদ্ধা জানাবে। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' সিট্রাইন ও চেম্বারলেন কেউই একথা বলেননি, কথাগুলি বলেছেন 'একাধিপতি' স্ট্যালিন।

জনসাধারণ যে ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা এটা ইউরোপের কোনো সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাই স্ট্যালিনের মতো উপলব্ধি করেননি। কাজেই ইউরোপের কোনো সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতা জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হননি। আমরা প্রায়ই লোকেদের মধ্যে সোভিয়েটে স্ট্যালিনের প্রশংসা প্রসঙ্গে আলোচনা শুনতে পাই। একতরফা সমালোচনারও অন্ত নেই। আজকে সোভিয়েটে জনসাধারণ যদি তাঁদের নেতার গুণগান করার জন্য অভিযুক্ত হয় তবে সে নেতারও জনসাধারণের প্রশংসা করার জন্য অভিযুক্ত হওয়া উচিত। এই পারস্পরিক প্রশংসা হচ্ছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক। ফ্যাসিস্ট নেতারা বা আমাদের বৃটিশ গণতান্ত্রিক নেতারা কেউই আমাদের ''শুধু জনসাধারণ শাশ্বত'' এ কথা বলেন না। স্ট্যালিন এটা উপলব্ধি করেছেন এবং কথায়ও সেটা প্রকাশ করেছেন। সে কারণেই স্ট্যালিন দেশবরেণ্য।

সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর আমাকে একটি প্রশ্ন বহুবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ঃ ''বৃটিশ নাগরিকরা যেমন হাইড পার্কে মিলিত হয়ে চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে প্রচারমূলক কাজ চালাতে পারে, সোভিয়েট নাগরিকরা কোনো পার্কে গিয়ে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সেরূপ কিছু বলতে পারে কী?'' বৃটিশ গণতান্ত্রিকদের কাছে এ হচ্ছে গোড়ার কথা। আমার উত্তর হচ্ছে, সোভিয়েটে কোনো নাগরিক পার্কে গিয়ে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কিছু বললে জনসাধারণ তাকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য করবে। আজকে মোস্‌লে লন্ডনের রাস্তায় যেরূপ সংবর্ধনা পায়, সে তার চাইতে হাজার গুণ বেশি ভয়ঙ্কর সংবর্ধনা পাবে। আর একটি তফাৎ হচ্ছে যে, পুলিশ সেই অবাঞ্ছিত বক্তাকে সমর্থন না করে জনসাধারণকে করবে সমর্থন।

ধরে নেওয়া গেল বৃটেনে ভবিষ্যতে প্রগতিশীল দলের সমর্থনে সরকার নির্বাচিত হল এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, সবেতন ছুটি, শ্রমিকদের বিনা খরচায় চিকিৎসা ও বেকার লোকেদের জন্য পুরো বেতন প্রথা প্রবর্তিত হল। তাহলে এরূপ সরকার, এরূপ দল ও তার নেতারা বৃটিশ জনসাধারণের বেশির ভাগ লোকের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করবেই। এ ধরনের সরকারকে তারা নিজেদের সরকার বলে মনে করবে যেটা আগে তারা কোনো সরকার সম্বন্ধে মনে করতে পারেনি।

এ ধরনের গভর্নমেন্ট কোনো প্রগতিশীল আইন প্রবর্তন করতে চাইলেই ধনী মালিকরা তখন সেটাকে বাধা দেওয়ার জন্য জোর চেষ্টা করবে। এ ধরনের সরকার যখন দেশের বেশি সংখ্যক লোকের হিতার্থে ধনী মালিকদের স্বার্থে ঘা দেয়, তখন দেখতে পাওয়া যায় যে জনসাধারণের তাদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ ধ্বংসমূলক কার্যে, এমনকী সশস্ত্র প্রতিরোধ করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। পরিস্থিতি বেশি সংকটজনক হলে সাধারণ শ্রেণীর লোকের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই সব প্রগতিশীল নেতারা জনসাধারণের কাছে তাদের নিজেদের দাবি সমর্থনের জন্য আবেদন জানায়। ফলে তাদের মর্যাদা যায় বেড়ে। জনসাধারণের উপর যাদের আস্থা নেই, জনসাধারণও তাদের উপর আদৌ আস্থাবান নয়। যখন রাজনৈতিক দল দেখতে পায় যে তারা আস্তে আস্তে সমর্থন হারাচ্ছে, তখন তারা ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য শেষপর্যন্ত সন্ত্রাসমূলক পন্থা অবলম্বন করে। এক সময়ে গণতন্ত্রের সমর্থক থাকলেও আজকে গণতন্ত্রের বিরোধী কার্যকলাপের জন্যই সেই সমস্ত দল বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। এভাবে একদলীয় প্রথার হয় উদ্ভব। এতে জনসাধারণও এই দলকে রাষ্ট্রের মতো নিজেদের বলে ভাবতে শেখে। এবং এই দলের নেতারা ও সরকার হয় জনপ্রিয়, আর তাদের পেছনে থাকে অগণিত জনগণের সমর্থন। এ ভাবেই স্ট্যালিন আজ সোভিয়েটে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই নীতির ফলে — যেসব লোক প্রকাশ্যে পার্কে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা ও তার নেতাদের নিন্দা করে — জনসাধারণের বিচারালয়ে তারা গণতন্ত্রের বিরোধী বলে সাব্যস্ত হবেই। এতে অবশ্য এটা বোঝায় না যে এর ফলে সমালোচনার ও সমালোচনার সুবিধার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। অপরদিকে আজকে সোভিয়েটে পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের চেয়ে খারাপ শাসনব্যবস্থার জন্য তীব্র সমালোচনা হয়ে থাকে। জনসাধারণ সর্বান্তঃকরণে বর্তমান শাসনব্যবস্থা ও তার নীতিকে সমর্থন করে। কারণ তারা জানে যে, এই সরকার জনস্বার্থে সংগঠিত, কিন্তু কোনো আইনের অপপ্রয়োগ হলে বা জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী হলে তারা তীব্র সমালোচনা করে। সে জন্যই আজকে সোভিয়েট পত্রিকায় অক্ষমতার বিবরণ, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কথা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

এখানে অবশ্য আমাদের একটা বিষয়ে ধারণা আরো পরিষ্কার হওয়া উচিত। সোভিয়েট পত্রিকার কত খবর যে লোকেরা আমার কাছে উল্লেখ করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই, যেমন একটি খবর হল ঃ একটি সোভিয়েট কারখানার উৎপাদনের শতকরা সত্তর ভাগ হল ব্যবহারের অযোগ্য। বর্তমান অবস্থায় সোভিয়েটে কী করে এটা সম্ভব আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। উত্তর দিয়েছি, সোভিয়েট কাগজে যখন এটা বেরিয়েছে তখন এটা সত্য না হয়ে যায় না। আমাদের এই অবস্থা সম্বন্ধে কোনো ভুল ধারণা করা ঠিক হবে না। আমরা যেন ধরে না নিই যে — সোভিয়েট কারখানায় যেহেতু এ সব ঘটে, তাই এই কারখানাগুলি ধনতান্ত্রিক দেশের কারখানার চেয়ে ঢের বেশি অনুন্নত। আমাদের দেশে অস্ত্র নির্মাণের উন্নতির সময়ে এমনকী এরোপ্লেন তৈরির কারখানাগুলোর শতকরা সত্তর ভাগ উৎপাদন হতো নেহাৎ বাজে। কিন্তু আমাদের পদ্ধতিতে এ ধরনের জিনিসের সমালোচনার কোনো স্থান নেই। যে প্রতিষ্ঠান খারাপ মাল তৈরি করে সেটা তারা প্রকাশ করে না। কারণ তাতে শেয়ারের দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতে না গড়ানো অবধি কতক বাজে দোকানে ভেজাল মাল বিক্রি বন্ধ হয় না। সোভিয়েটে কেউ যদি সরকারি দোকানে ভেজাল মাল চালাচ্ছে বলে সন্দেহ করে তবে তা অনায়াসে পত্রিকায় বের করতে পারে। সেখানে রয়েছে সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা।

সাম্যবাদী নয় অথচ 'সমাজতান্ত্রিক' এরকম লোক সব সময়ে অভিযোগ করে থাকেন যে সোভিয়েটে আজকে কমিউনিস্ট দলের স্বৈরতন্ত্র চলছে। ওরা শুধু যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও লোকপ্রিয় সংঘগুলোয়ও তারা আধিপত্য করে। কী করে তারা অন্যান্য সংঘগুলোর উপর আধিপত্য করে? কর্মকর্তা নির্বাচনে পার্টি সদস্যরা জনগণের বেশি সমর্থন লাভ করে। একমাত্র এভাবেই তারা এতখানি সাফল্যলাভ করে যে বিভিন্ন দলের পরিচালক সমিতিতে পার্টি সভ্যই থাকে বেশি। এতে অনিষ্টকর বা অগণতান্ত্রিক কিছুই নেই। আজকে বৃটেনে যদি এরূপ একটি লোকপ্রিয় রাজনৈতিক দল থাকে যে দলের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা আছে তবে আজকে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে অবস্থা বিদ্যমান এদেশেও আমরা সেরূপ একটা অবস্থায় পৌঁছতে পারব। তখন আমরা

আটের পাতায় দেখুন

মার্কিন অত্যাচার লজ্জা দেবে নাৎসিদেরও

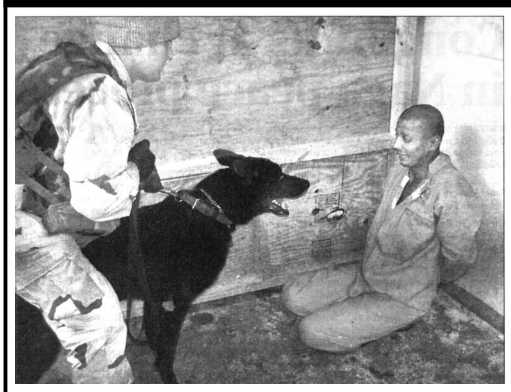

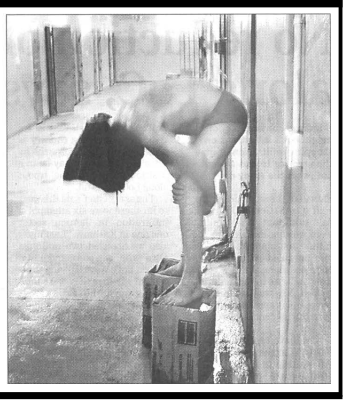

ইরাকি বন্দীদের উপর অত্যাচার বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

ভিয়েতনামীদের কান কেটে মালা পরত মার্কিন সেনারা

কথায় কথায় মার্কিনী গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য যাঁরা প্রচার করেন, তাঁরা কী বলবেন ইরাকি যুদ্ধবন্দীদের উপর মার্কিন সেনাদের বীভৎস অত্যাচার দেখে? যাঁরা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে আমেরিকাকে তুলে ধরেন, তাঁরা ইরাক আক্রমণ, গ্রাম-শহর-জনপদ ধ্বংস করা, বোমা মেরে মেরে দেশটাকে শ্মশানস্তূপে পরিণত করাকে কী দৃষ্টিতে দেখবেন? তাঁরা কি পারবেন আমেরিকাকে পরদেশ লুণ্ঠনকারী, গণতন্ত্র-স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হত্যাকারী হিসাবে আখ্যায়িত করতে? পারবেন কি এইসব অপকর্মের জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আমেরিকাকে অভিযুক্ত করতে ?

কোন দেশ মানুক আর না মানুক আমেরিকা বিশ্ব মানবাধিকারের স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়ান। গত বছর ২০ মার্চ 'ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে' — এই মিথ্যা এবং সাজানো অজুহাতে আমেরিকা গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র নিয়ে ইরাক আক্রমণ করে তার ঔদ্ধত্য বিশ্ববাসীকে জানান দিল, যেন খানিকটা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাইল, 'আমেরিকার কথা মত না চললে তোমাদেরও পরিণতি হবে ইরাকের মত।' এই আগ্রাসী মনোভাব মার্কিন গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে বড়ই বিদ্রূপ করে। সাদ্দামের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার মিথ্যা অজুহাতে যে আমেরিকা ইরাকে হানাদারি চালাল, অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিল যুদ্ধের রীতি-নিয়মকানুন সবই দু'পায়ে মাড়িয়ে — সেই আমেরিকা যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে কী আচরণ করছে? কারাগারের কুঠরি থেকে সংবাদের ছিটেফোঁটা যতটুকু বাইরে এসেছে তাতেই শিউরে উঠেছে গোটা দুনিয়ার মানুষ।

বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে আবু ঘ্রাইব জেলে বন্দীদের উপর অত্যাচার কী বীভৎস! যুদ্ধবন্দীদের নগ্ন করে একজনের উপর আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে নগ্ন মানুষের পিরামিড তৈরি করে মার্কিন সেনারা কদর্য উল্লাস করেছে। বন্দীদের উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। বসরায় জোট সেনারা ইরাকি বন্দীদের মাথা কাপড়ে মুড়ে দিয়ে লাথি মেরেছে, গায়ে প্রস্রাব করেছে। ইরাকের ১৬টি কারাগারে প্রায় ৭০০০ যুদ্ধবন্দী রয়েছেন। নগ্ন অবস্থায় তাদের চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে অবিরাম প্রচণ্ড জোরে বাজনা বাজানো হচ্ছে। বিবস্ত্র করে চোখে চড়া আলো ফেলে লাগাতার র‍্যাপ মিউজিক চালিয়ে দিনের পর দিন বন্দীদের জেগে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। বন্দীদের নগ্ন করে হাত পিছমোড়া করে বেঁধে গলায় কুকুরের বগলস পরিয়ে কারাগারের দরজার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঁধে রাখা হয়েছে। খাদ্য ও পানীয় ঠিকমত সরবরাহ করা হচ্ছে না। সারাদিনের জন্য খাওয়া ও পরিচ্ছন্নতার জন্য বরাদ্দ মাত্র এক বোতল জল। দাসত্ব বরণ না করার জন্য ইরাকিদের এই শাস্তি দিচ্ছে আমেরিকা। পুরুষদের নগ্ন করে পুরুষাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, পিন ফুটিয়ে দেওয়া প্রভৃতি বর্বর পৈশাচিক আক্রমণ চালিয়েছে। এর পরেও কোন সুস্থ চেতনার মানুষ বলতে কি পারেন আমেরিকা মানবাধিকারের মূল্য দেয়, গণতন্ত্রের মর্যাদা দেয়, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে? এই বর্বর অত্যাচারের ব্লুপ্রিন্ট যারা রচনা করে তারা কি সুস্থ চেতনার মানুষ?

প্রতিবাদ উঠছে আজ বিশ্বজুড়ে। খোদ আমেরিকার ভেতরেই স্লোগান উঠছে যে বুশ প্রশাসন আমেরিকার মর্যাদাকে কালিমালিপ্ত করছে, ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখানোর জন্য আমেরিকা বলছে, এটা কতিপয় সেনার অপকীর্তি, বিচ্ছিন্ন ঘটনা। অথচ মাসের পর মাস এই 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা অবিচ্ছিন্নভাবে চলছে কী করে? এই অত্যাচার সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে। যারা অত্যাচার করবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য স্কুল অব আমেরিকা (SOA) পরিচালনা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের ডিরেক্টর পিয়ের কারচেনবুয়েলও জেনিভায় বলেছেন, ''গত বছর (২০০৩) মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা ইরাকের বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। এমন কিছু কিছু ঘটনা তাঁদের নজরে আসে, যেগুলিকে যুদ্ধবন্দীদের উপরে অত্যাচারই বলা যেতে পারে। এইসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়, একটি বৃহৎ চলতি ব্যবস্থার অঙ্গ।'' (আনন্দবাজার ৯/৫/০৪)।

এই চলতি ব্যবস্থাটি একটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা — যে ব্যবস্থাটি তার অন্তর্নিহিত কারণেই পরদেশ লুণ্ঠন, আক্রমণ এবং যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারে না। যুদ্ধবন্দীদের উপর আক্রমণ যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এ যে একটি ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত ব্যাপার — তা স্বীকার করেছেন মার্কিন সামরিক পুলিশের সদস্যা সাব্রিনা হারমানও — যার উপর দায়িত্ব ছিল অত্যাচার করে করে ইরাকি বন্দীদের অবস্থা সঙ্গীন করে তোলা।

ইরাকি বন্দীদের উপর মার্কিন সেনার এই বীভৎস অত্যাচার যে বাস্তবে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন শাসকশ্রেণীর চরিত্রই যে এই, তা কি ভিয়েতনাম আক্রমণের সময়ে আমেরিকান সেনাদের এই একই বীভৎস আচরণ বিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি? সেই দানবীয় অত্যাচার মানুষ আজও ভুলতে পারেনি। তাই ইরাক প্রসঙ্গে আজ বারবার উঠে আসছে ভিয়েতনামের নাম।

ষাটের দশকের শেষ দিকে ভিয়েতনাম দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমেরিকা। ভিয়েতনামের খেতে খামারে কর্মরত চাষীদের গুলি করে হত্যা করা, বাঙ্কারে আশ্রয় নেওয়া নারী ও শিশুদের গ্রেনেড ছুঁড়ে হত্যা করা, আক্রমণের স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে কান ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া, মাথা থেকে চামড়া তুলে নেওয়ার মত পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা। কে কত হত্যা করতে পেরেছে তার ভিত্তিতে মার্কিন সেনাবাহিনীতে তখন প্রমোশন হতো। সেনাদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা গড়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এটা অন্যায় মনে হলেও করতে হবে। ভিয়েতনামের গ্রামীণ জনগণ যাতে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে না পারে সেজন্য তাদের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হতো, তাদেরকে মার্কিন সেনা ছাউনির কাছে রাখা হতো। যারা আসতে চাইত না তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। গভীর রাতে বাড়ি বাড়ি ঢুকে অত্যাচার চালাত মার্কিন বাহিনী। ভিয়েতনামীদের কান কেটে মালা তৈরি করে পরতো, সেনাবাহিনীর ইংরেজি নির্দেশ বা কথাবার্তা না বুঝলে সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করা হত। ১৯৬৮ সালে কুখ্যাত 'মাইলাই' হত্যাকাণ্ডে ৫০০০ ভিয়েতনামী নাগরিককে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল মার্কিন সেনাবাহিনী। আফগানিস্তানে ২০০১ সালে আফগান যুদ্ধবন্দীদের বাক্সের মধ্যে প্রায় বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় ভর্তি করে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত না দিয়ে প্রখর সূর্যের মধ্যে ফেলে রাখা হয়। হাইতি এবং গুয়েতেমালায় একইভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার করে করে সেনাবাহিনীর অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল।

আমেরিকার জেলেও এরকম বীভৎস অত্যাচারের ঘটনা আকছার ঘটছে। আমেরিকার জেল অফিসার, বন্দী ও মানবাধিকার প্রবক্তারাও একথা বলেছেন। ''জর্জ বুশ যখন টেক্সাসের গভর্নর ছিলেন তখন সেখানকার নানান জেলে কয়েকটি সাংঘাতিক অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম ওয়েন জানিয়েছেন, ওই রাজ্যের জেলগুলিতে ধর্ষকামী কারারক্ষীদের মদতে যৌনদাস হিসাবে বন্দী কেনাবেচা হয়। ১৯৯৯ সালে একটি মামলা চলাকালে বন্দীদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, জেলের মধ্যেই ওদের পশুর মত ধর্ষণ করা হয়, মারধর আর অন্য সব অত্যাচার তো আছেই।'' (আনন্দবাজার ৯/৫/০৪)।

ইদানিং আমেরিকাতে জেল ব্যবসা রমরমিয়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে বহু বেসরকারি জেলখানা। এই ব্যবসার খদ্দের পেতে, হয় কথায় নয় কথায় ধরে নিয়ে এসে জেলে পোরা হচ্ছে। বুর্জোয়া দুনিয়ার মডেল আমেরিকা এভাবে আজ কসাইখানায় পরিণত হচ্ছে। মুনাফাই এদের লক্ষ্য, মানুষ এদের কাছে মূল্যহীন। মানুষকেও এরা মনে করে পণ্য।

বুর্জোয়া সমাজের এই হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতার অবসান কীভাবে সম্ভব? কীভাবে সম্ভব বুর্জোয়াদের শোষণের অবসান ঘটানো? সে পথ দেখিয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব সঠিকভাবে চিহ্নিত করে মার্কসবাদ দেখিয়েছে, শ্রেণীহীন সমাজের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব একটি অনিবার্য ঘটনা এবং এই ব্যবস্থাতেই বুর্জোয়াদের শোষণ-নির্যাতনের অবসান ঘটবে। বন্ধ হবে একশ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর দমনপীড়ন। এইরকম একটি ব্যবস্থা মানব

আটের পাতায় দেখুন

পদ্ধতি কোথায় আলাদা, মুখ্যমন্ত্রী

একের পাতার পর

কর্মীর ভবিষ্যৎ।

আসলে, মুখে যাই বলুন না কেন, বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ কিংবা সরকারি সংস্থা বন্ধ করে দেবার প্রশ্নে বিজেপি বা কংগ্রেসের মতো দলগুলির সঙ্গে সিপিএমের আজ আর মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। বিদেশি পুঁজির মালিকরা যাতে পশ্চিমবঙ্গকে তাদের লুণ্ঠনের অশেষ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করে, তাই পুঁজিপতিদের চোখে পশ্চিমবঙ্গকে আকর্ষণীয় করে তোলার তাঁদের কী মরিয়া প্রচেষ্টা! এ রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার, নিকাশী ব্যবস্থা, এমনকী স্বাস্থ্যব্যবস্থার দরজা পর্যন্ত বেসরকারি পুঁজির জন্য খুলে দিয়েছে এই সরকার ঠিক বিজেপি বা কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারগুলির মতই। স্বদেশি পুঁজির প্রতিও সিপিএম ফ্রন্ট সরকার সমান সদয়। এ রাজ্যে ৪০টিরও বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলে দেশি পুঁজি-মালিকদের শিক্ষা বেচে মুনাফা লোটার খাসা বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। মুখে একদিকে তাঁরা শ্রমিক দরদের বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন, আর তাঁদেরই চোখের সামনে বন্ধ চা-বাগানের শ'য়ে শ'য়ে শ্রমিক মরছে অনাহারে। চা-বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে কিন্তু সরকারি কর্তারা নিশ্চুপ। বিজেপি ও কংগ্রেসের মত বুর্জোয়া সরকারগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সিপিএম সরকারও এ রাজ্যে তৈরি করেছে 'স্পেশাল ইকনমিক জোন', যেখানে ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে শ্রমিকদের টুঁ শব্দটি করাও নিষেধ। বিশেষ পরিষেবামূলক ক্ষেত্র নাম দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মীদের কাছ থেকে তাদের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে মরতে বসা শ্রমিকরা তাদের কাজ বাঁচানোর মরিয়া প্রচেষ্টায় যখন মালিকের শর্তে অর্ধেক মজুরিতে কাজ করতে রাজি হয়ে যায় তখন বুদ্ধদেববাবুদের দল সিপিএম বা তাদের শ্রমিক সংগঠন সিটু কোনরকম আওয়াজই তোলে না।

কংগ্রেস বা বিজেপি'র বিরুদ্ধে 'বাম' নামধারী এই দলগুলির হুঙ্কার যে কতখানি ভণ্ডামি, পুরনো ইতিহাসও তার সাক্ষ্য দেয়। ১৯৯৬-৯৮ সালে কেন্দ্রে সিপিআই এবং সিপিএমের সাহায্যে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল, 'বিলগ্নীকরণ কমিশন'-এর নামে 'বিলগ্নীকরণ মন্ত্রক'-এর সূচনা সেই জমানাতেই। বেসরকারীকরণকে সমর্থন করে এদেশে সেই প্রথম রচিত হয়েছিল বিলগ্নীকরণ নীতিসংক্রান্ত ঘোষণাপত্র। সেই ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম এবং সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি। সরকারি সংস্থাগুলি বিলগ্নীকরণ করা চলবে না বলে আজ গলা ফাটাচ্ছে যে সিপিআই এবং সিপিএম, যুক্তফ্রন্টের আমলে সেই তারাই ৫৬টি সরকারি সংস্থাকে চিহ্নিত করেছিল বিলগ্নীকরণের জন্য।

এসব কথা সাধারণ মানুষ মনে না রাখলেও পুঁজি-মালিকরা কিন্তু ভোলেননি। নিজেদের স্বার্থরক্ষাকারী দলটিকে চিনে নিতে তাঁদের ভুল হয়নি। তাই কেন্দ্রে সিপিএমের মতো 'বামপন্থী'দের সমর্থনে সরকার হলে আর্থিক নীতির হাল কী হবে তা নিয়ে যখন কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তখন পুঁজিমালিক-শিল্পপতিরা কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। বামপন্থী নামধারীদের সহায়তায় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে স্বাগত জানিয়ে সমস্বরে এঁরা মন্তব্য করেছেন — এর ফলে সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে কোনো সমস্যা হবে বলে তাঁরা মনে করেন না।

দিল্লি থেকে ফিরে রাজ্যের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের সাথে সরকারে না যাওয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন, তেলে আর জলে কখনও মিশ খায়না। কিন্তু যদি দুটোই জল বা তেল হয়, তাহলে তো মিশতে কোন অসুবিধা নেই।

ইরাকে স্বাধীনতার লড়াই চলছেই

''কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান,
তারই লাগি কাড়াকাড়ি''

দক্ষিণ ইরাকের বন্দর শহর বসরা পুনর্দখল করার জন্য এক বিশাল ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী বসরা শহর ঘিরে রেখেছে। শহরের স্থানে স্থানে জোট সেনাদের সঙ্গে মেহেদী সেনাদের জোর সংঘর্ষ চলছে। জোট সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরও জোরদার করার জন্য একটি আত্মঘাতী বাহিনী গঠন করার আবেদনে সাড়া দিয়ে বসরা শহরের নাগরিকদের মধ্যে নাম লেখানোর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এক কিশোরের বাবা-মা চিঠিতে লিখেছেন, ''আমাদের সন্তানের চাইতে দেশের স্বাধীনতা অনেক বেশি মূল্যবান। শয়তানদের তাড়িয়ে দেশকে মুক্ত করার জন্য সন্তানের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আমরা তাকে আত্মঘাতী বাহিনীতে পাঠালাম। তার মৃত্যুর জন্য আমরা ছাড়া আর কেউ দায়ী থাকবে না।'' আজ ইরাকে এমন অভিভাবকের সংখ্যা অগুণতি।

পথে পথে আগুনের ব্যারিকেড

সাদার সিটি — আগের নাম ছিল সাদ্দাম সিটি, যা বাগদাদ শহরের যমজ শহর নামেও সুপরিচিত। সেই সাদার সিটিতে মার্কিন ট্যাঙ্ক ও সেনার আনাগোনা বন্ধ করার জন্য শহরের নাগরিকরা পথে নামেন। রাস্তায় রাস্তায় পুরনো টায়ার, ভাঙাচোরা গাড়ি ও আবর্জনার স্তূপ জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তৈরি করেন ব্যারিকেড। সেই ব্যারিকেডে ধাক্কা খেয়ে ফিরে চলে যায় মার্কিন ট্যাঙ্ক — শহরে আর ঢুকতে পারেনি। ফিরে যাওয়ার সময় মার্কিন ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়িগুলিকে লক্ষ্য করে কিশোর ও যুবকরা পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে মারে। ফলে সাদার সিটিতে মার্কিন সেনা ও ট্যাঙ্ক অভিযান আপাতত বন্ধ রেখেছে পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ।

(দি স্টেটসম্যান, ১৯-৫-০৪)

মার্কিন দালাল ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান নিহত

১৭ মে বাগদাদ শহরের কেন্দ্রস্থলে 'গ্রিন জোন' নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে অবস্থিত ইরাকি কাউন্সিলের সদর দপ্তরে এক বৈঠকে যোগ দিতে যাবার সময় গ্রিনজোনে প্রবেশ পথে এক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে গভর্নিং কাউন্সিলের নব নিযুক্ত প্রধান ইহুদিন সলিম নিহত হয়েছেন। গ্রিনজোনে ঢোকার মুখে নিরাপত্তা রক্ষীদের দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য বহু গাড়ি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, শেষের সারিতে ছিল ইহুদিন সলিমের গাড়ি। আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে ইহুদিন সলিমের গাড়ি সহ মোট ১২টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। সলিম এবং আরও ১০ জন বিস্ফোরণে মারা গেছে।

এবারকার বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে সুরক্ষিত 'গ্রিনজোন' অঞ্চলে মোট দুটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলো। এর আগে ৬ মে'র বিস্ফোরণের ঘটনায় ৮টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নিরাপত্তা রক্ষী এবং ৪ জন মার্কিন সেনা সহ মোট ২২ জন নিহত হয়েছিল। (ডেকান হেরাল্ড, ১৮-৫-০৪)।

তেল ভাণ্ডার ব্যবহার করতে দেবে না গেরিলা যোদ্ধারা

ইরাক থেকে তেলের সরবরাহ বিপর্যস্ত করার জন্য ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধারা পাইপ লাইনের উপর একের পর এক আঘাত হানছে। বসরা থেকে ২০০ মাইল দূরে উমর বসর বন্দরের কাছাকাছি দুটি তেল উত্তোলনের টার্মিনাল গেরিলারা নৌকা বোমার সাহায্যে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বসরা এবং ঘোর আল-আমায়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে যাওয়া দক্ষিণের পাইপ লাইনটিকেও গেরিলারা একই দিনে ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছে। এই পাইপ লাইন দিয়ে প্রতিদিন ১.৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বিদেশে রপ্তানি করা হতো। 'ফ' (FAW) বন্দীপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উত্তরের পাইপ লাইনটিকেও গেরিলারা ধ্বংস করায় এই পাইপলাইনে দিয়ে যাওয়া দৈনিক ১.৬ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রপ্তানিও বন্ধ হয়ে গেছে।

এদিকে, উমর বসর বন্দরের নিকটবর্তী তেল উত্তোলনের দুটো টার্মিনাল সহ আরো কয়েকটি টার্মিনাল ইরাকি গেরিলারা ধ্বংস করে দেওয়ায় ইদানীং ইরাকে তেল উত্তোলন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যতটুকু উত্তোলন হয় তা দিয়ে দেশের চাহিদাই মেটানো যাচ্ছে না। এর ফলে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলির ট্যাঙ্কারগুলি যেমন শুকিয়ে গেছে তেমনি ইরাকে মার্কিন সেনাবাহিনীর চারটি যান্ত্রিক (সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাঙ্ক বাহিনী) ইউনিট মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টারের উড়ান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ফালুজায় মার্কিন মেরিন সেনাদের বিপর্যয় ; তিকরিত, বাকুবা থেকে মার্কিন সেনাদের পিছু হঠা — এসব ঘটনার জন্য তেল সঙ্কট দায়ী বলে পেন্টাগনের একাংশের অভিমত। (দি হিন্দু ১৫-৫-০৪)।

শেয়ার বাজার

একের পাতার পর

উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা ঘটানো হয়েছে এবং তা যদি হয়ে থাকে তবে কারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করেছে ?

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, শেয়ার বাজারের ধস ও দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক ধস — এক জিনিস নয়। এটা বুঝতে হলে শেয়ার বাজার যার অংশ, সেই মূলধনী বাজারের কাঠামোটা কেমন তা মোটামুটি বুঝতে হবে।

শেয়ার বাজার বাস্তবে ফাটকা ও লুঠের বাজার

মূলধনী বাজারের প্রধান দুটি ভাগ। একটি ভাগ হল প্রাইমারি মার্কেট, যেখানে মূলত নতুন শেয়ার বিক্রি হয়। নতুন শিল্প তৈরি করার জন্য বা পুরনো শিল্প সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মালিক শেয়ার বেচলে সেই নতুন শেয়ার আসে প্রাইমারি বাজারে। তাই এই বাজারে তেজি ভাবের অর্থ শিল্পক্ষেত্রে অধিক মূলধন বিনিয়োগ বা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং সেই অর্থে তা অর্থনীতির অগ্রগতির সূচক। কিন্তু বাস্তব হল, বর্তমানে ভারতীয় শেয়ার বাজারের প্রাইমারি মার্কেটে শেয়ার বিক্রি প্রায় শূন্যের কোঠায়। কারণ, অর্থনীতি তীব্র মন্দায় আক্রান্ত। উল্লেখযোগ্য নতুন শিল্প বা পুরনো শিল্পের সম্প্রসারণ হচ্ছে না বললেই চলে। কাজেই নতুন শেয়ার তেমন আসছে না বাজারে।

মূলধনী বাজারের দ্বিতীয় ভাগটি হল সেকেন্ডারি বাজার, যেখানে কেবলমাত্র পুরনো শেয়ারের হাতবদল হয়। ফলে এই বাজারে যে পুঁজি আসে তার পিছনে শিল্প প্রসারের বা নতুন শিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কাজ করে না, তা কেবল পুরনো শেয়ারের চাহিদা বাড়িয়ে তার দর বৃদ্ধি ঘটায়।

এই দ্বিতীয় ভাগটি বা সেকেন্ডারি বাজারটিই হল স্টক মার্কেট, চলতি কথায় শেয়ার বাজার। বিশ্বপুঁজিবাদের ও সেই সাথে ভারতীয় পুঁজিবাদের তীব্র সংকটের বর্তমান স্তরে নতুন শিল্পায়ন বা শিল্প প্রসার অতি নগণ্য, তাই প্রাইমারি মার্কেটের গুরুত্ব এখন তলানিতে ঠেকেছে। সমস্ত রমরমাই এখন সেকেন্ডারি বাজারে। কারণ শিল্পে বা কৃষিতে বাড়তি বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় বিপুল উদ্বৃত্ত অলস পুঁজি দ্রুত মুনাফার লোভে ঢুকছে সেকেন্ডারি বাজারে। চাহিদা-যোগানের পুঁজিবাদী নিয়ম অনুযায়ী শেয়ার বাজারেও পুরনো শেয়ারের দাম ওঠা বা পড়ার কথা। বিক্রির যোগান চাহিদার চেয়ে বেশি হলে দাম পড়ে যাওয়া, আর ক্রেতা বেশি হলে দাম বাড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের যুগে তা হয় না। এই যুগে বড় বড় পুঁজিমালিকরা তাদের পুঁজির জোরে ইচ্ছামতো কৃত্রিমভাবে বিক্রি বাড়িয়ে দাম ফেলে দিতে, বা ক্রয় বাড়িয়ে দাম চড়াতে পারে। এভাবেই তারা দর চড়িয়ে বা দর কমিয়ে ইচ্ছামতো মুনাফা করে, অর্থাৎ বাজার আর বাজারের পুঁথিগত নিয়মে চলে না, বাজারকে একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করে। দাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চাহিদা-যোগানের স্বাভাবিক পুঁজিবাদী নিয়মকে তারা পুঁজির জোরে উড়িয়ে দিয়ে চালু করে ফাটকার নিয়ম।

শেয়ার বাজার প্রায়ই ওঠে নামে কিন্তু তা একটা সীমার বাইরে সহজে যায় না, সীমার মধ্যেই ওঠে নামে। এটা সবাই জানে। কিন্তু কেন ? এ প্রশ্ন করলে বাজার বিশেষজ্ঞরা বলেন — শেয়ার বাজারের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। ক্রেতাবিক্রেতার আশা-আকাঙ্ক্ষা বা মর্জির ওপর তা নির্ভর করে, যার পূর্বানুমান করা খুব শক্ত। একেই তাঁরা বলেন 'মার্কেট সেন্টিমেন্ট' বা বাজারের মর্জি। আসলে এই কথার দ্বারা দেশি-বিদেশি একচেটে লগ্নি পুঁজির মালিকদের পুঁজির জোরে পরিকল্পনা-মাফিক কৃত্রিমভাবে শেয়ারের দাম কমানো বাড়ানোর দ্বারা মুনাফা লোটার প্রবণতা তথা ফাটকাবাজিকে তাঁরা আড়াল করেন। বাস্তবে এদেশের শেয়ার বাজার যে দেশি-বিদেশি বৃহৎ ফাটকা পুঁজিমালিকরা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং গোটা শেয়ার বাজারটাই কার্যত ফাটকা বাজারে পরিণত হয়েছে — এই সত্যটি 'বাজারের সেন্টিমেন্ট' নামক ছেঁদো তত্ত্বের নামে তাঁরা আড়াল করতে চান। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ফাটকাবাজির উপর নির্ভরশীল কৃত্রিম পদ্ধতিতে

সাতের পাতায় দেখুন

স্কুলে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে
আমেরিকায় ছাত্রদের ৭০ মাইল মার্চ

উদারীকরণের প্রবক্তা খোদ আমেরিকাতেও উদারীকরণের কুফল ফলতে শুরু করেছে। কমছে শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দ। বাড়ছে ফি, চালু হচ্ছে ডোনেশন। এবং যথারীতি তার বিরুদ্ধে ছাত্র-অভিভাবকরা প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলছেন। ৯ এপ্রিল আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার রিচমন্ডে ছাত্ররা সরকারের শিক্ষা বাজেট হ্রাস করার প্রতিবাদে ৮ দিনে ৭০ মাইল মার্চ করে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন উপসাগরীয় অঞ্চল সহ গোটা রাজ্যের ছাত্রছাত্রী, যুদ্ধবিরোধী বিভিন্ন সংগঠন ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলির কর্মীরা। মার্চ শুরুর পূর্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং কলেজের ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

এ বছর শরতে ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়েস্ট কন্ট্রা কোস্টার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের অভিভাবক, শিক্ষক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের নিয়ে প্রত্যেক দিন ১২ মাইল হেঁটে সান পাওলো থেকে রাজধানী স্যাক্রামেন্টোতে পৌঁছবেন। রাস্তায় তাঁরা বিভিন্ন স্কুল, পার্ক, চার্চে বিশ্রাম নেবেন এবং সেখানে নানান জায়গায় বক্তৃতা দেবেন এবং আন্দোলনের জন্য কর্মী সংগ্রহ করবেন।

ক্যালিফোর্নিয়া সরকার আজ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থটুকুও দিতে রাজি নয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, বরাদ্দ অর্থের সম্পূর্ণটাই মঞ্জুর করতে হবে। অর্থের অভাবে স্কুলগুলিতে কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরি বন্ধ করে দিচ্ছে, খেলাধূলা ও সঙ্গীতের কর্মসূচিগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লাইব্রেরিয়ান ও সহকারীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে, এমনকী প্রাথমিক স্কুলের প্রিন্সিপাল ও সঙ্গীত শিক্ষকদের পর্যন্ত ছাঁটাই করা হচ্ছে। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের কাছ থেকে ডোনেশন নিচ্ছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এও মনে করেন যে, সরকারি বরাদ্দ ছাড়া ফি বাড়িয়ে বা ডোনেশন নিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ৬ মে)

শেয়ার বাজারের রাজনীতি

ছয়ের পাতার পর

শেয়ার বাজারের ওঠা-নামার সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতি বা অগ্রগতি সবসময় নির্ভর করে না। এ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ।

শেয়ার বাজারে ধস আর দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ধস — এক জিনিস নয়

এই বিশাল ফাটকাবাজারের সঙ্গে দেশের মূল অর্থনীতি কৃষি বা শিল্পের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এখন আর তেমন নেই। পরোক্ষ যোগাযোগ যতটুকু তা শুধু এইটুকুই যে, মূল অর্থনীতিতে মন্দা যত বাড়ে ততই উদ্বৃত্ত অলস পুঁজি দ্রুত মুনাফা লুঠতে ফাটকাবাজারে হাজির হয়। ফাটকা আরও ব্যাপক ও তীব্র হয়। তাই প্রায়শই দেশের অর্থনীতিতে গভীর মন্দার সময়ে শেয়ারবাজার নামক ফাটকাবাজারে দারুণ তেজিভাব দেখা যায়। ঠিক এইটেই চলছিল কংগ্রেসের নয়া আর্থিক নীতির নগ্ন অনুসারী বিজেপি'র গত পাঁচ বছরের শাসনে। একদিকে শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতির তীব্র সংকট ও অর্থনীতিতে চূড়ান্ত মন্দার ফলে কল-কারখানা শ'য়ে শ'য়ে বন্ধ হচ্ছিল, লাখে লাখে মানুষ কাজ হারাচ্ছিল, অন্যদিকে ফুলে ফেঁপে উঠছিল শেয়ার বাজার। রোজ সেনসেক্স চড়ছিল। আজ শেয়ার কিনে দু'দিন বাদে বাড়তি দামে বেচে দু'হাতে মুনাফা লুঠছিল বড় বড় দেশি-বিদেশি একচেটে ফাটকা পুঁজির মালিকরা। বিজেপি সরকার বিশ্বায়নের যুক্তি তুলে দেশের শেয়ার বাজার বিদেশি পুঁজির কাছে খুলে দেওয়ায় এবং লাভজনক সরকারি সংস্থার লোভনীয় শেয়ার বিক্রি, যা কংগ্রেসই শুরু করেছিল, বিজেপি তা বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেওয়ায় বিদেশি পুঁজিলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় শেয়ারবাজারে লক্ষ লক্ষ ডলার ঢালতে থাকে। যার ফলে বিদেশি মুদ্রার সরকারি ভান্ডারটি ফুলে ওঠে এবং বিজেপি তার 'ফিল গুড' প্রচারে এই বিশাল অঙ্কের জমা বিদেশি মুদ্রাকেই তাদের বিরাট সাফল্য বলে প্রচার করে। শুধু বিদেশি পুঁজিই নয়, বিজেপি'র অনুসৃত এই ব্যবস্থার সুযোগে দেশি লগ্নিপুঁজির একচেটে মালিকরা বিদেশি সংস্থার মাধ্যমে বা মরিশাস (যেখানে ভারত সরকারই চুক্তি করে কর কমিয়ে রেখেছে) ঘুরে এদেশের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে তাদের কালো টাকা সাদা করেছে এবং ফাটকাবাজির দ্বারা বিপুল লাভ করেছে। কিন্তু তার দ্বারা দেশে শিল্পের প্রসার বা কর্মসংস্থান বা উৎপাদনবৃদ্ধি কিছুই ঘটেনি। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, শেয়ার বাজার নামক ফাটকা বা লুঠের বাজারের সমৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির যেমন কোন উন্নয়ন ঘটে না, তেমনি শেয়ার বাজারের ধস দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ধস বোঝায় না।

তাহলে দেশের অর্থনীতি 'গেল' 'গেল' বলে রব তোলা হল কেন, কার স্বার্থে

অথচ, ১৭ মে সোমবার শেয়ার বাজারে অভূতপূর্ব ধস নামার সাথে সাথে শিল্পপতি মহল, বৃহৎ শেয়ার দালাল, সংবাদপত্র রেডিও টিভি একেবারে 'গেল' 'গেল' রব তুলে দিল যেন গোটা দেশের অর্থনীতিই রসাতলে যেতে বসেছে। পুঁজিবাদের স্বাভাবিক অবস্থায় শেয়ার বাজারের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটত। কিন্তু আজ যখন শেয়ার বাজার পুরোপুরি ফাটকা বাজার বা জুয়ার আড্ডায় পরিণত, যখন দেশের অর্থনীতির সঙ্গে তার অতীতের মতো যোগ আর নেই — তখন শেয়ার বাজারের ধসকে জাতীয় অর্থনীতির বিপর্যয় বলে চালানোর এই মরিয়া প্রচেষ্টা কেন ? কীভাবে শেয়ার বাজারে ধস নামল, বৃহৎ পুঁজির কারসাজি ছাড়া যে এমন নাটকীয় পতন বা উত্থান সম্ভব নয় — এসব প্রশ্নে না ঢুকেই এক বাক্যে তারা বলে দিল — 'সংস্কার নীতি' 'বিলগ্নীকরণ' প্রভৃতি প্রশ্নে নতুন সরকারের অস্পষ্টতা এবং 'লাভজনক সরকারি শিল্পে বিলগ্নীকরণ হবে না', 'বিলগ্নীকরণ দপ্তর তুলে দেওয়া হবে' বলে সীতারাম ইয়েচুরি ও এ বি বর্ধনের মন্তব্যে শেয়ারবাজারে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে ; বাজারের 'সেন্টিমেন্ট' বিগড়ে গিয়েছে, আশঙ্কার ফলে শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়েছে। ফলে ক্রেতাদের চাহিদার চেয়ে বিক্রেতাদের বেচবার তাগিদ ও বাজারে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গিয়ে ধস নামিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের তৈরি করা বাজারের 'সেন্টিমেন্টে'র ছেঁদো যুক্তিরই অবতারণা করে তারা নাটের গুরুদের আড়াল করল। নতুন প্রধানমন্ত্রী 'বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ' মনমোহন সিং বললেন — নেপথ্যে কলকাঠি যদি কেউ নেড়ে থাকে তবে কারা তারা তা খুঁজে বের করা হবে এবং অপরাধীদের যোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু ওই ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্তই শেষ, কাউকেই খুঁজে বের করা হল না, কারো শাস্তি হল না। কেবল কংগ্রেস ও নতুন সরকারের নেতারা তড়িঘড়ি বাজারকে আশ্বস্ত করতে পুনরায় জোর দিয়ে বললেন, 'সংস্কার কর্মসূচি' অব্যাহত থাকবে। সিপিএম নেতারাও শেয়ার কেলেঙ্কারির তদন্ত চাইলেন এবং 'এটা তেমন কোন ব্যাপার নয়', 'এর সঙ্গে ব্যাপক জনগণের কোন যোগ নেই'-বলে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এই ঘটনা অনিবার্যভাবেই কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল; তা হল — কারা এই ঘটনা ঘটাল, এর দ্বারা কার স্বার্থ রক্ষিত হল?

এই ঘটনা 'সংস্কার কর্মসূচি' অব্যাহত রাখতে সুবিধা করে দিল না কি?

একথা সকলেই জানেন যে, ১৩ মে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর যখন দেখা গেল বিজেপি ক্ষমতা হারাচ্ছে এবং সিপিআই(এম)-এর সমর্থনে কংগ্রেস জোট গদিতে বসতে যাচ্ছে, তখন থেকেই দফায় দফায় কংগ্রেস নেতারা তো বটেই এমনকি সিপিএম নেতারাও বললেন, তাঁরা 'সংস্কার কর্মসূচি' অব্যাহত রাখবেন। শিল্পপতিমহলও বলল — নয়া সরকার 'সংস্কার'-এর পথেই থাকবে, এ প্রশ্নে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রশ্ন একটা ছিল, তা হল এই দলগুলি, বিশেষ করে সিপিএম, ভোটে যেভাবে বিজেপির আর্থিক নীতি, বেসরকারীকরণ-বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালিয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক নীতি পরিবর্তনের প্রত্যাশা জাগিয়েছে, তারপর গদিতে বসে সেই পুরানো নীতিই অনুসরণ করলে তারা দ্রুত অপ্রিয় হবে এবং জনসাধারণের কাছে তাদের নগ্ন মালিকতোষণ নীতি আড়াল করা কঠিন হয়ে পড়বে।

একথা কারো অজানা নয় যে, এবারের নির্বাচনে মানুষ যে চূড়ান্তভাবে বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে তা শুধু উগ্র হিন্দুত্ববাদের জন্য নয়। উগ্র হিন্দুত্বকে মানুষ মেনে নেয়নি ঠিকই, কিন্তু বিজেপি বেপরোয়াভাবে কংগ্রেস প্রবর্তিত আর্থিক নীতি অনুসরণ করায় কলকারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই, বেকারি, বাধ্যতামূলক অবসর, মূল্যবৃদ্ধি, চাষীর ফসলের দাম না পাওয়া, স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ কমানো প্রভৃতি কারণে বিপুল সংখ্যক গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে প্রবল আর্থিক সঙ্কট যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল তা বিজেপির ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অন্যতম কারণ। নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষ এই অবস্থা থেকে বাঁচতে চেয়েছে। বিজেপি অনুসৃত আর্থিক নীতিই যে তাদের জীবনের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ — এভাবে বুঝেই জনগণ নয়া আর্থিক নীতির পরিবর্তন চেয়েছে।

ভোটে ফায়দা তুলতে বিজেপির আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে সিপিএমের ব্যাপক প্রচার স্বাভাবিকভাবেই জনমনে এই প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছে যে, তারা ক্ষমতায় বসলে আর্থিক নীতিতে পরিবর্তন আনবে। বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ ও জনস্বার্থে ভরতুকি দেওয়ার প্রশ্নে তারা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জন-মনমোহিনী প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। অথচ বিজেপি ক্ষমতায় বসে যে আর্থিক নীতি অনুসরণ করেছে সেটা কংগ্রেসেরই প্রবর্তিত আর্থিক নীতি, যা এদেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে রচিত হয়েছে — পুঁজিবাদের চরম আর্থিক সঙ্কটের সমস্ত বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে পুঁজিপতিদের মুনাফা অটুট রাখার জন্য। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলি এই কাজ করতে বাধ্য। এমনকী, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমও ক্ষমতায় থাকার জন্য, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যের বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন তুলে কথার মারপ্যাঁচে একই কাজ করে চলেছে। ফলে, যে নতুন সরকার গঠিত হল, সেই সরকার এই আর্থিক নীতির বাইরে যেতে পারেনা। পার্থক্য বড় জোর এটুকু হতে পারে যে, বিজেপি 'উন্নয়নের' লেবেল লাগিয়ে নিষ্পেষণের যে স্টিমরোলারটি চালাচ্ছিল, এরা সেই স্টিমরোলারের লেবেলে 'উন্নয়নের' সাথে 'জনস্বার্থ' কথাটা জুড়ে দেবে। কিন্তু জনগণের মধ্যে আর্থিক নীতি পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলা হয়েছে সেটা খেয়ালে রেখে সরকার গঠনের আগেই বিলগ্নীকরণবিরোধী যেসব কথা বলা হচ্ছিল তার ফলে একটা আশঙ্কা বৃহৎ ফাটকাবাজ মালিকগোষ্ঠী, বিশেষত যারা বিজেপির শাসন-আমলে বিপুল মুনাফা কামিয়েছে, সেই বিশেষ মালিকগোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। কাজেই 'আমরা সংস্কার-বিরোধী নই' বলে কংগ্রেস-সিপিএম নেতারা বারবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, রাতারাতি শেয়ার বাজারে ধস ঘটিয়ে তারা পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করল — এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অন্যদিক থেকে দেখলে এমন ভাবাও অস্বাভাবিক নয় যে, নবগঠিত সরকারের পক্ষে 'সংস্কার' অব্যাহত রাখার পথে জনগণের বিরোধিতা প্রশমিত করে তা মানিয়ে নিতে সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই শেয়ারবাজার ধসের এই ঘটনা ঘটানো হল। শেয়ারবাজারের পতনকে যেভাবে জাতীয় অর্থনীতির বিপর্যয়ের সঙ্গে একাকার করে দেখিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হল তাতে এ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখন বাস্তবতার দোহাই দিয়ে এই সরকার সহজেই বলতে পারবে 'তড়িঘড়ি সংস্কার নীতি বদলাতে গেলে বিপর্যয় ঘটে যাবে'। এই যুক্তির আড়ালে জনগণকে বিভ্রান্ত করে 'ধীরে চলো' স্লোগান তুলে 'সংস্কার' এবং নয়া আর্থিক নীতি চালু রাখা তাদের পক্ষে সহজ হবে। শেয়ারবাজারের এই ঘটনা শেষ পর্যন্ত 'সংস্কার অব্যাহত' রাখার কাজে তাঁদের সুবিধা করে দিচ্ছে — একথা বুঝেই কি কংগ্রেস ও সিপিএম নেতারা ফাটকাবাজ অপরাধীদের খুঁজে বের করার ও শাস্তি দানের কথা বলেও তারপর চুপ করে গেলেন? এ প্রশ্ন যদি কারোর মনে দেখা দেয়, তাহলে তা কি খুব অস্বাভাবিক হবে ?

এ ব্যাপারে আর একটি দিকও নজরে পড়ার মতো, তা হল, পতনশীল বাজারকে চাঙ্গা করতে নয়া এবং বিদায়ী দুই সরকারের শিরোমণিদের উদ্বেগ ও তৎপরতা। এক্ষেত্রে অতি দ্রুত তেরঙা-গেরুয়া ভেদাভেদ মুছে গেল। 'সেবি'র কর্তারা বিদেশভ্রমণ ছেড়ে দৌড়ে এলেন। মনমোহন সিং ফোন করলেন পূর্বতন অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হাকে। তড়িৎ গতিতে সরকার স্টেট ব্যাঙ্ক, লাইফ ইন্সিওরেন্স, ইউনিট ট্রাস্ট প্রভৃতি সংস্থাকে হুকুম দিল বিপুল পরিমাণে শেয়ার কিনে বাজারে যোগানের চেয়ে কৃত্রিমভাবে চাহিদা বাড়িয়ে শেয়ার দরকে ঠেলে উঁচুতে তুলে দিতে। সরকারের নির্দেশে এসব সংস্থার কর্তারা সংস্থার কাছে জমা রাখা জনগণের টাকা অকাতরে ঢেলে শেয়ার বাজার বহুলাংশে চাঙ্গা করে দিল। যে জনগণ শেয়ারবাজারের অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচতে সরকার অনুমোদিত অর্থলগ্নী সংস্থায় টাকা রেখেছিল, তাদের কষ্টার্জিত টাকাকে সরকার অনিশ্চিত শেয়ার বাজারে জড়িয়ে দিল। ভবিষ্যতে শেয়ারবাজার যখন আবার পড়বে তখন জনগণের এই টাকার ঘোষিত পূর্ণমূল্য ফেরৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকবে না, যা ঘটেছে ইউনিট ট্রাস্টের বেশ কিছু প্রকল্পে। এভাবে জনস্বার্থ বলি দিয়ে শেয়ারবাজার বাঁচাতে কত শত কোটি টাকা ঢালা হল তার হিসাব প্রকাশিত হয়নি।

প্রশ্ন হল, শেয়ার বাজার বিপদে পড়লে অর্থাৎ টাটা-আম্বানি-বিড়লা-গোয়েঙ্কার কোম্পানির শেয়ারের দাম কমলে পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলির পার্থক্য ঘুচে যায়, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে, অথচ জনগণ বিপদে পড়লে, বাজারে জিনিসের দাম বাড়লে, কলকারখানা বন্ধ হলে, মানুষ রুজি-রোজগার হারালে এরা উদাসীন, ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকে কেন? যারা শেয়ার বাজার চাঙ্গা করতে কোটি কোটি টাকা ঢালে, তারাই জনস্বার্থে টাকা দেওয়ার প্রশ্ন উঠলেই বলে, তহবিল নাকি শূন্য। কেন বলে? কারণ, এরা আসলে একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর সরকার, তাদের ত্রাতা। এরা জনগণের সরকার নয়, তাই শেয়ার বাজারের উত্থানপতনে এরা যেমন বিচলিত হয়, জনগণের মরণবাঁচনের প্রশ্নে তার শতাংশের একাংশও হয় না। ফলে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস জোট সরকারের কাছ থেকে জনগণের সমস্যা আরও তীব্র হওয়া ছাড়া অন্য কিছু পাওয়ার নেই।

ভ্রম সংশোধন

১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে এস ইউ সি আই-এর প্রার্থী ছিল না। গত সংখ্যায় ভুলবশত প্রার্থী ছিল বলে ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

— সম্পাদক, গণদাবী

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

জ্যোতিষশাস্ত্র চালু করতে সুপ্রিম কোর্টের সম্মতির নিন্দা করল এ আই ডি এস ও

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র চালু করার বিরুদ্ধে কয়েকজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা 'স্পেশাল লিভ পিটিশন' সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশিষ রায় এক বিবৃতিতে বলেন —

এটা অত্যন্ত দুঃখের যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র চালু করার জন্য ইউ জি সি যে নির্দেশ দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের আবেদন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ বাতিল করে দিয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই জনবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্ট তাতে হস্তক্ষেপ করবে না বলে যে রায় দিল, সেটা অত্যন্ত দুঃখের।

বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে বলেছেন যে, বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র আধুনিক বিজ্ঞানের পুরোপুরি পরিপন্থী এবং এই বিদ্যা চালু করার অর্থ হবে এক বিরাট পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ। সমর্থকরা যতই বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করুন না কেন, বাস্তবে এটি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। শিক্ষাক্রমে তা চালু করা হলে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠার পথে তা বাধা সৃষ্টি করবে, খোদ বিজ্ঞানের বিকাশেই বাধা দেবে এবং অন্ধবিশ্বাস ও ছাঁচে ঢালা চিন্তাপদ্ধতির জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করবে।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার অত্যন্ত দুর্বল অজুহাত দিয়ে বলেছে, এটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে থাকবে এবং কোন কোন পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি এই শাস্ত্র পড়ানো হয়। আমরা বুঝতে পারি না, কী করে সুপ্রিম কোর্ট প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের দেওয়া অকাট্য যুক্তিগুলিকে উপেক্ষা করে সরকারি ছেঁদো যুক্তিগুলিকে গ্রহণ করতে পারে।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র চালু করার জন্য সরকার ও ইউ জি সি'র প্রচেষ্টা সমাজে অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, অন্ধবিশ্বাস ও অদৃষ্টবাদী মনোভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে, তাই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এ আই ডি এস ও ছাত্রসমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে। বস্তুত, বিদ্যার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবোধ গড়ে তোলাকেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলা হয় এবং আমাদের সমাজে আজ সেটা সর্বাধিক প্রয়োজন।

ইরাকে অত্যাচার বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

পাঁচের পাতার পর

সমাজে কাঙ্ক্ষিত হলেও বুর্জোয়ারা তা চায় না নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে। ফলে মার্কসবাদ বিরোধিতা, সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির একটি স্বাভাবিক এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার প্রখ্যাত ভাষাবিদ নোয়াম চমস্কি নিজে কমিউনিস্ট না হয়েও বলেছেন, 'কমিউনিজম বিরোধিতা আমেরিকান বিদেশনীতির অনিবার্য উপাদান।' কেন আমেরিকা কমিউনিজমের বিরোধিতা করে? সহজ কথায় চমস্কি বলেন, সমাজতন্ত্র নিজস্ব সম্পদের উপর দাঁড়িয়ে একটি দেশকে যথাসম্ভব সমস্ত দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলে। ফলে অন্য দেশের উপর তার নির্ভরশীলতা থাকে না। পক্ষান্তরে আমেরিকা অন্যান্য দেশকে অর্থনৈতিকভাবে তার আজ্ঞাবহ দাসানুদাসে পরিণত করতে চায়। কমিউনিস্টরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করে।

বুর্জোয়া দুনিয়া তাই কমিউনিজমের নামে নানা কুৎসা রটায়। এবং এক্ষেত্রে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের রূপকার মহান স্ট্যালিনকে দানব এবং স্বৈরাচারী হিসাবে দেখিয়ে বলে সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র নেই। অথচ স্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্তদের বিচার হয়েছিল প্রকাশ্য আদালতে, যেখানে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত জুরিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্ট্যালিনই তাঁদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিচার দেখে তাঁরা বলেছিলেন, এমন মুক্ত পক্ষপাতহীন বিচার তাদের বিস্মিত করেছে। বিশ্বের কোন বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন গণতান্ত্রিক বিচারপদ্ধতি কল্পনাই করা যায় না। ব্রিটেনের লেবার পার্টির সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ মরিসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ১৯৫১ সালে স্ট্যালিন বলেছিলেন, "মিঃ মরিসন, পারেন তো এমনকী একজন সোভিয়েট সৈন্যকেও দেখান, যে শান্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে? না, এমন একজন সোভিয়েট সৈন্যও নেই।" স্ট্যালিন সেদিন একথা বলেছিলেন কোরিয়ায় শান্তিপ্রিয় জনগণের উপর ইঙ্গ-মার্কিন সেনার বীভৎস অত্যাচারের প্রসঙ্গে। বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পাশাপাশি সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এই পার্থক্যকে মানুষের দৃষ্টি থেকে মুছে দিতেই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসায় মত্ত হয়েছে।

দেশে দেশে বুর্জোয়াদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণমুক্তির স্বপ্ন যারা দেখেন আজ তাদের বুর্জোয়া অপপ্রচারের কৌশলী দিক বুঝে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হতে হবে। ইরাকি বন্দীদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে যে নিন্দা এবং ধিক্কার ধ্বনি উঠেছে এবং আমেরিকাকে পিছু হটতে হচ্ছে, তারও পেছনে রয়েছে ইরাকের বীর জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম। যা প্রমাণ করে, জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামই একমাত্র পুঁজিবাদী- সাম্রাজ্যবাদীদের মাথা নত করতে পারে।

স্ট্যালিনের রাশিয়ায় গণতন্ত্র

পাঁচের পাতার পর

দেখতে পাব যে সেই দলই শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। এবং জনসাধারণও দলের অনুসৃত নীতি থেকে উপকৃত হওয়ার ফলে সেই দলের সভ্যদের করবে সমর্থন শুধু স্থানীয় বা জাতীয় নির্বাচনে নয় — ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক সংঘেও। কার্যত আমরা দেখতে পাব যে, যদি জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নিয়ে একটি প্রকৃত জনগণের দল গড়ে ওঠে তাহলে জনসাধারণ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সংঘের নির্বাচনে সেই দলের সভ্যদেরই করবে সমর্থন, কারণ তারা তখন জানতে পারবে যে এ অবস্থায় দলের সভ্যই জনগণের সংহতি ও আকাঙ্ক্ষার একমাত্র প্রতীক। এ ধরনের দল আমাদের পার্লামেন্টারি দল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোতে শ্রেষ্ঠ নাগরিকরা রয়েছে বা থাকবে — এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। দলে যে শুদ্ধমাত্র শ্রেষ্ঠ নাগরিকরাই থাকতে পারবে সেটা নিশ্চিত করার জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কারের মতো কোন পদ্ধতি সোভিয়েটের বাইরে কোথাও নেই। অন্যত্র সভ্যরা ইচ্ছা করলে অর্থের জোরে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে। তাদের কাজের কোনো কথা আদৌ বিচারে আসে না।

১৯৩১ অবধি সোভিয়েটে বাস করে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, যদি বৃটেনে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকারী গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয় তবে সে দল উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবেই। সেটিই হবে দেশে একমাত্র অগ্রগামী শক্তি, সেটি হবে জনগণের সংগঠিত অগ্রবাহিনী এবং সেই দলের নেতারা তাদের কাজ ও নীতির জন্য সাধারণ শ্রেণীর লোকের পাবে সমর্থন। আজকে সোভিয়েট রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দল ও নেতারা — স্ট্যালিন, মলোটোভ, কালিনিন, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ যেরূপ পেয়ে থাকেন তারাও ঠিক সেরূপ সমর্থন পাবেন।

সোভিয়েটে দলের নেতাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এটা ধরে নেওয়া হয়, যে দলের কেন্দ্রীয় পরিষদই সমস্ত নতুন আইনকানুন প্রণয়ন করে থাকে। একথা আদৌ ঠিক নয়। সোভিয়েটে সাধারণ নরনারী দৈনন্দিন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় স্ট্যালিনের বক্তৃতা হচ্ছে তারই একটা জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। স্ট্যালিন স্বর্গ থেকে এ সব বক্তৃতার বিষয়বস্তুর প্রেরণা পান না, পান সারা দেশব্যাপী অজস্র প্রস্তাব, স্থানীয় সমস্যার মীমাংসা, সুপারিশ, পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি, দলের নেতৃবৃন্দ ও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত অভিযোগ থেকে। স্থানীয় সমস্যা, সুপারিশ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর খবরাখবর সংগ্রহ করে কোন্ সিদ্ধান্ত নেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তা স্থির করে তবেই সোভিয়েট কেন্দ্রীয় দল বা সরকার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কয়েকটি লোক আমাদের বিশ্বাস না করিয়ে ছাড়বে না যে, স্ট্যালিন নিজেই সোভিয়েট নীতির সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করে থাকেন। নেতা হিসাবে স্ট্যালিনের একটা অত্যাশ্চর্য গুণ এই যে, নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ে তিনি এমন নীতি নেন যা সমস্ত জনসাধারণের হিতকর হয়। স্ট্যালিন নিজেও এটা বহু বার বলেছেন যে সাধারণ মজুরশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সমিতির উপদেশ তেমন কোনো কাজে আসে না। কাজেই স্ট্যালিন যখনই কোনো ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তখনই জোর দিয়ে বলেছেন যে তাঁর বক্তব্য সমস্ত জাতির মনের কথার প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বিষয়ের নিষ্পত্তি নির্ভর করে ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর মতামতের উপর এবং উৎপাদনব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা সভা, দেয়ালপত্র, পত্রিকা, স্থানীয় সোভিয়েটের প্রতি নির্দেশনামা, সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ কমিশন, ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক সভা, ঊর্ধ্বতন পরিষদের সভ্য ও দলের নেতাদের কাছে প্রেরিত অভিযোগপত্রের উপর। সাধারণ মানুষের দাবি ও নিয়মিত আলোচনার প্রবাহের ফলে সোভিয়েট কেন্দ্রীয় সমিতি তাদের সিদ্ধান্তে আসে। স্ট্যালিন নিজে বলেছেন, যদি অগ্রণী দল এরূপ কোনো সিদ্ধান্ত করে বসে যা লোকের সেই বিশেষ কাজের উপযোগী নয় তবে তা কার্যকরী হতে পারে না এবং এর ফলে অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে এমন একটি যুক্ত অঙ্গবিশেষ যেখানে হাজার হাজার লোকের সম্মিলিত মতামত ছাড়া কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। লক্ষ লক্ষ লোকের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে যে কোনো ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়া সম্ভব। দলের কাজ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নীতি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য নেতাদের কাজের সমাবেশ করা। এটা করতে গিয়ে দলের সবচেয়ে বড় কাজ হল, শ্রমিকশ্রেণীর ভেতর থেকে শ্রেষ্ঠ কর্মীদের দলে আনা। একমাত্র এভাবেই দলের মর্যাদা বজায় থাকে।

এই পদ্ধতিতে আমাদের জানা। পার্লামেন্টারি রাজনীতির খেলার কোনো স্থান নেই। কারণ একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একটি নেতৃত্বের পতাকার নিচে সমস্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হওয়ার পর বিভিন্ন বিবদমান দলের আদৌ কোনো স্থান থাকতে পারে না।

আমার সোভিয়েট বাসের প্রথম দিকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন মতের ভিত্তিতে একাধিক দলের উৎপত্তি সম্বন্ধে জল্পনা আমি করেছিলাম। আমি এখন এর কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাই না। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে, কতকগুলো মৌলিক সার্বজনীন স্বার্থের ভিত্তি থাকা দরকার। একটি মাত্র ইস্যু অবলম্বন করে একটি রাজনৈতিক দল গঠন সম্ভবপর নয়, কারণ সেই ব্যাপারে সবাই এক জোটে কাজ করলেও অন্য ব্যাপারে মতদ্বৈধতা বা অমিল আসা খুবই স্বাভাবিক। তারপর আপনি শ্রমিকদের দলের বিরুদ্ধে আবার মালিকদের দল গঠনও করতে পারেন, মূলগতভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থবিরোধী মালিকদের দলের সৃষ্টি করতে পারেন, দুর্বল সাহায্যপ্রার্থী কুটির শিল্পের বিরুদ্ধে বড় বড় কারখানা বসাতে পারেন, মালিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে ইচ্ছুক এরূপ শ্রমিক সংঘও গড়তে পারেন। কিন্তু যখন সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক একত্রে মিলিত হয়ে ধনতন্ত্রের সমাধি রচনা করে তখন এ সমস্ত দ্বন্দ্বের মূলে পড়ে আঘাত। ফলে বিভিন্ন স্থায়ী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার ভিত্তি যায় চূর্ণ হয়ে।

[স্ট্যালিন অনুসৃত এই নীতি ও কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল বলেই ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সঙ্গে গভীর আত্মিক যোগ হারাতে শুরু করে। এর পরিণতিতে শেষপর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহুদলীয় নির্বাচনও সেখানে হচ্ছে। কিন্তু জনগণের বৃহৎ অংশ বলছে তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।]

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net